ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ

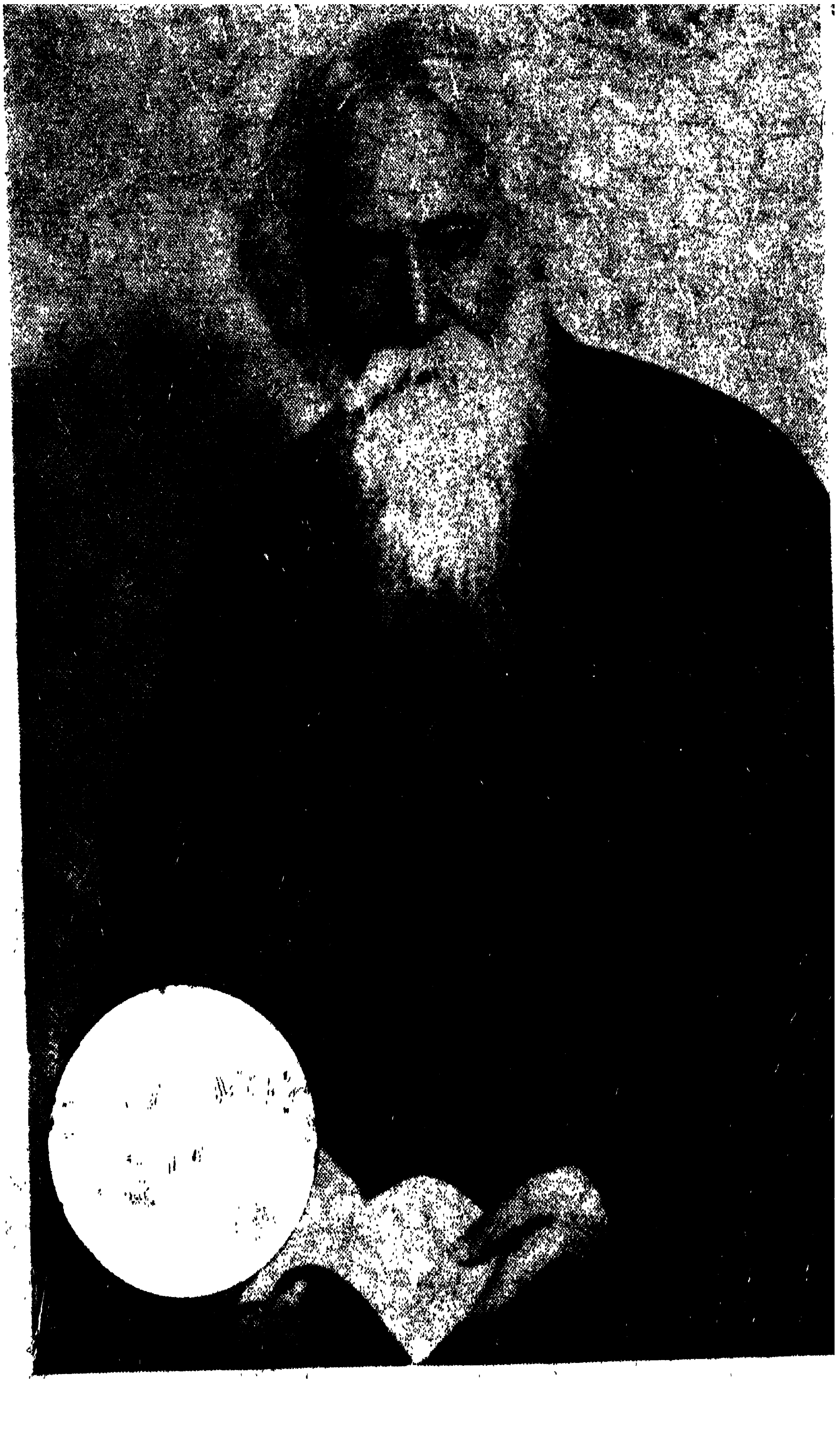

ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ

অক্ষয়কুমার বসুমজুমদার

কালচারাল পাবলিকেশনস্,
২২৬/২, ডি. এইচ. রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬০

উৎসর্গ

'ভারতসাধক মহাত্মা গান্ধী', 'ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ', 'নব-নবীনের কবি নজরুল', 'সংগ্রামী কবি সুকান্ত'—আমার লেখা এই চারখানি বই বাঙালীজাতিকে উৎসর্গ করলাম—এই আশায় যে, এই বইগুলি পড়ে মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালীরা ধর্মমতনির্বিশেষে সম্মিলিত ভাবে বর্তমান অবনয়নের যুগ থেকে উন্নয়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

অক্ষয়কুমার বসুমজুমদার

Published by Mrs. Emily Bose
On behalf of
The Cultural Publications, Calcutta,
226/2, D. H. Road,
Calcutta—700063.

3205

প্রথম প্রকাশ জুন—১৯৯১
জ্যৈষ্ঠ—১৩৯৮

শ্রীমতী রাধারাণী ভদ্র,
সুশীল প্রিন্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৬

মূল্য—৪০ টাকা

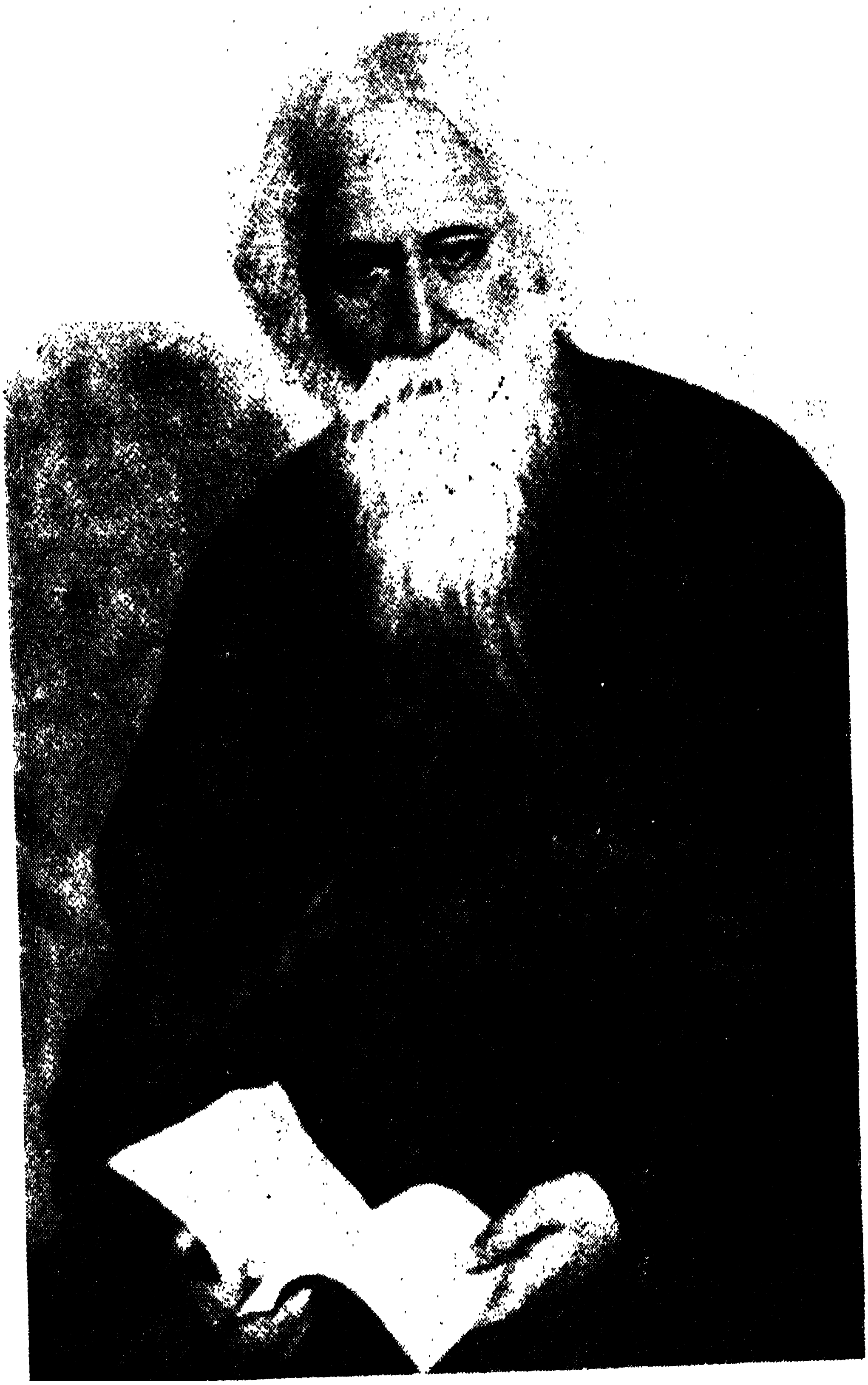

রবীন্দ্রনাথ

"ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্সি ও খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Rabindranath Tagore

"At a time when 'people are tired of theories', they are drawn by Tagore's practical spirituality. He (Tagore) is the epitome of the international outlook. Unlike Gandhi for whom the path to enlightenment lay through the establishment of the nation, Tagore was a 'revolutionary', who sought unity not only of Bengal or India, but of the whole world."

—Robin Ramsay, Australian Actor, (Published in the Statesman, Thursday, September 8, 1988)

সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় কবি, বড় সাহিত্যিক, বড় সঙ্গীত-রচয়িতা, বিশিষ্ট চিত্রকর, মহান শিক্ষা-সাধক নহেন, তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও তাঁর সমাজভাবনা, শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়। বর্ণ, অঞ্চল, ধনী-নির্ধন, অগ্রসর-অনগ্রসর, সারা পৃথিবীর নানাবিধ মানবগোষ্ঠীর সকলের জন্য তাঁর মানব-ভ্রাতৃত্বের ও মানব-অভ্যুদয়ের বাণী। তাই তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরেও জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমরা তাঁর চিন্তা, কর্ম ও রচনা থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারি এবং নিত্যই তা নানা কর্মে ও চিন্তায় যুগযুগব্যাপী আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

এই মানব-হিতসাধনার দৃষ্টিকোণ থেকেই "ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ" বইখানা লেখা হয়েছে।

পরিচায়িকা

ইংরেজি সাহিত্যের সুখ্যাত অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার বসু মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবিত চারখানি গ্রন্থের ('ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ', 'ভারতসাধক মহাত্মা গান্ধী', 'নব-নবীনের কবি নজরুল', 'সংগ্রামী কবি সুকান্ত') বক্তব্য বিষয় অভিনব এবং সূক্ষ্ম মননধর্মী বলে এই পরিচায়িকা লিখতে বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। শ্রীযুক্ত বসু মজুমদার মহাশয় একটি মূল কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের চেতনার স্বরূপ বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তেরটি অধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে ন'টি অধ্যায়, নজরুল সম্বন্ধে ন'টি অধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে পাঁচটি অধ্যায়ের সাহায্যে লেখক তাঁদের জীবন, বাণী ও সাধনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-বিচার ও মানবধর্মী আলোচনার নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন, নতুনভাবে তাঁর বক্তব্য, বিচারপ্রণালী ও সিদ্ধান্তকে যৌক্তিকতার মানদণ্ডে পরিমাপ করেছেন। কাজটি দুরূহ সন্দেহ নেই। কারণ ইতিপূর্বে ঐ একই বিষয়ে নানা জনে আলোচনা করেছেন, একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বহুজনের চলাচলের পথে নিজের জন্য পৃথক্ পথ নির্মাণ করা সহজ ব্যাপার নয়। এই গ্রন্থগুলির পাঠক-পাঠিকারা আমার মতোই উপলব্ধি করবেন যে, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। লেখকের সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনায় নতুন মূল্যবোধে বিকীর্ণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে মূলতঃ ভারত-পথিক তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য তিনি পৌরাণিক ভারতবর্ষের সীমাকে বিশ্ববোধে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু ভারত-ঐতিহ্যের তিনি ধারক ও বাহক। বৈদিক যুগ, উপনিষদের ভাবধারা, সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুপদী ইতিহাস এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সেকথা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। চেতনার সজীবতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্কীর্ণতা থেকে রক্ষা করেছে। ভারতের পুনর্জাগরণে কবিগুরুর অবদান কতটা এবং কী পরিমাণে সার্থক তা লেখক অনুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বহুজনের মিলিত কণ্ঠের কোলাহল তাঁর মনটিকে চাপা দিতে পারেনি তা যে-কোনো সচেতন পাঠক লক্ষ্য করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বিরদ-রদ নির্মিত সু-উচ্চ মিনার চূড়া থেকে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, দু'জন কবি, অর্থাৎ নজরুল ও সুকান্ত ঠিক সেভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁরা দু'জনেই মৃত্তিকাসম্ভব। ধূলিম্লান, বিবর্ণ ও পরাভূত মহাসত্তাকে তাঁরা নব-নবীনের জীবনরসে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্তরসের কবি, নজরুল-সুকান্ত রুদ্ররসের কবি। অবশ্য নজরুলের ভক্তিসঙ্গীত, প্রেমগীতিকা ও গীতিকবিতায় আর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সুকান্ত বিপ্লবী কবি, তরুণ বয়সেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধেই তাঁর মরণপণ সংগ্রাম। সুতরাং যে-মাপকাঠির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে পরিমাপ করতে হয়, সেই একই মানদণ্ডে নজরুল-সুকান্তকে উপস্থাপিত করতে হলে কিছু বিরোধের মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু আনন্দের কথা, লেখক এই বিরোধ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত এবং এই দ্বৈতভাবকে যথাসম্ভব একটি ঐক্যের মুখে পরিচালিত করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ যে নিতান্ত নৈতিক অপাপবিদ্ধ চেতনা নয়, তার সঙ্গে জীবনের দুঃখলাঞ্ছনা ও বঞ্চনাও জড়িয়ে আছে, সে কথাটি লেখক আশ্চর্য তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। গান্ধীজীর আদর্শ ও জীবনধারা এযুগের কর্মব্যস্ত উপযোগবাদের মধ্যেও সে অপূর্ব প্রাসঙ্গিক এবং প্রত্যয়সিদ্ধ ধারণা, তা শ্রীযুক্ত বসু মজুমদার দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবীকালের শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্ব গান্ধীজী-পরিচালিত পথে না চললে আগামী মৃত্যু-মহামারী থেকে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবেনা। মনে হচ্ছে, একথাটা যেন আধুনিক প্রতীচ্য বুঝতে পেরেছে, তাই তারা সমাজ, জীবন ও রাজনীতিকে নতুনভাবে দেখতে প্রস্তুত হচ্ছে—তারই জয়ধ্বনি পশ্চিমবিশ্বে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসুমজুমদার চিন্তার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, রচনার ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশ। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে পরিচায়িকা লিখতে কিছু কুণ্ঠা বোধ করছি। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ থেকে যে মানসিক ভোজের আনন্দ পেয়েছি সেই কটি কথা প্রকাশের জন্য এই ভূমিকার অবতারণা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

“[illegible]কবি রবীন্দ্রনাথ” বইখানি লিখতে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করতে হয়েছে, তেমনই তাঁর জীবনীকার ও সমালোচকদের-ও অনেক বই পড়তে হয়েছে। তবে আমি বিশেষভাবে ঋণী, কৃষ্ণ কৃপালনী ও প্রবোধচন্দ্র সেন—এঁদের কাছে।

আমার আশির দশকের সব কখানা বই লেখার ব্যাপারে লাইব্রেরী থেকে বই এনে সহায়তা করেছেন, আমার কন্যা স্বাগতা, আর প্রকাশনায় প্রুফ দেখার সহায়তা করেছেন, আমার পুত্রবধূ শ্রীপর্ণা; আর আমার সহধর্মিণী এমিলী, যিনি গত আটচল্লিশ বছরে সবকাজে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখও আমার কর্তব্য।

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্ত সম্বন্ধে আমার সদ্য লেখা বইগুলি সম্বন্ধে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ও গবেষণায় অন্যতম শীর্ষস্থানীয়, ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পরিচায়িকা'-য় যে সহৃদয় অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাতে আমি অভিভূত।

এই বইখানা ছাপানোর ব্যাপারে “সুশীল প্রিন্টার্স”-এর শ্রীসুশান্ত ভদ্রের যত্ন ও চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরপুকুর
৩রা জুন, ১৯৯১

অক্ষয়কুমার বসুমজুমদার

সূচীপত্র

ভূমিকা	১—৫
ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক সত্তা	৭—১২
তপোবনে ভারতীয় জীবনধারা	১৩—২৪
বুদ্ধদেব ও অশোক	২৫—৩৪
কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য	৩৫—৪১
গুপ্তযুগ ও মোগল যুগের মধ্যবর্তীকাল	৪২—৪৮
রাজপুত, শিখ ও মারাঠাগণ	৪৯—৫৫
ভারতে য়ুরোপীয়দের আগমন ও বৃটেনের প্রাধান্য স্থাপন	৫৬—৬০
ভারতে পুনরুজ্জীবন	৬১—৬৮
বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন	৬৯—৭৪
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন	৭৫—৯৪
ভারত ও বিশ্ব	৯৫—১২৪

ভূমিকা

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর এ্যাণ্ড ইউনিভার্শাল হিউম্যানিজম' পুস্তকের মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর মূল্যায়ণ করেছেন :

"সারা পৃথিবীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তা সারা পৃথিবীর সসম্মান স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আছে সহস্রাধিক কবিতা, দুই সহস্রের মত গান এবং তদতিরিক্ত বহুসংখ্যক ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক ও বহুবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি। কবিতা ও গানের রচয়িতা রূপে তাঁর সমকক্ষ কদাচিৎ পাওয়া গেলেও তাঁকে অতিক্রম কেউ করেননি, ছোট গল্পের লেখক হিসাবে তাঁর স্থান পৃথিবীর এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ তিন-চার জন শিল্পীর পরেই। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসাবেও সারা পৃথিবীতে তাঁর সম্মানের আসন রয়েছে। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে যাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রথাগত চিন্তাধারা ও মানসিকতার প্রভেদ প্রচুর তাঁদের সম্বন্ধেও দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর সহানুভূতির নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন।

তাঁর সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর কিন্তু বহুমুখী সাহিত্যও তাঁর শক্তিকে নিঃশেষ করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং শুধু সঙ্গীত রচনা করেননি, তাতে সুরও আরোপ করেছেন; সঙ্গীতে তিনি প্রথম প্রচলিত ধারা নিয়ে শুরু করেছিলেন কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গীতের ধারা বিস্তৃতি লাভ করে এবং প্রতীচ্য সঙ্গীতের বহুলাংশ গ্রহণ করে প্রাচ্য প্রেক্ষাপটে উভয়ের সম্মিলন ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর বয়স যখন প্রায় সত্তর তখন তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন, তথাপি বছর দশেকের মধ্যে তিনি প্রায় তিন হাজার ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবিগুলিতে প্রচলিত ভারতীয় ধারাগুলি আশ্চর্যভাবে অতিক্রম করে মানব-মনের অবচেতন চিন্তাধারাকে তিনি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁর ছবিগুলোকে ভারতীয় ধারা থেকে সম্পূর্ণ অভিনব বলে আখ্যা দিয়েছেন; তবুও অনেক অনেক বিশেষজ্ঞ সমালোচক তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের একজন বিশেষ অর্থবহ এবং সৃজনশীল চিত্রকর আখ্যা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন, কিন্তু তাছাড়া ধর্ম, শিক্ষাসংক্রান্ত

চিন্তা এবং রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারত ও বিশ্ব পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

তিনি এসব বিষয়ে সৃজনশীল গভীর চিন্তা করতেন, শুধু তা নয়, এসব কাজে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন ; তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় শিক্ষাসংক্রান্ত যে সকল ধারণা ও প্রেরণা ছিল তা আধুনিক ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তা ও কাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সমসাময়িক ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সমবায় ও আত্মনির্ভরশীল যে কর্মধারা গ্রামীন সমাজে প্রবর্তন করেছিলেন, তা-ই বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে। সমগ্র মানবের একতা সম্বন্ধে তাঁর যে গভীর অনুভূতি ছিল তা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে পরস্পর নির্ভরশীলতাই জীবনের মূলমন্ত্র হতে হবে, যদি পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হয়। প্রাচ্যজগতের অতি প্রাচীন জীবনধারা, ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি আত্মস্থ করে তিনি নবযুগে প্রতীচ্যের মূল্যবোধকেও সাদরে গ্রহণ করে আধুনিক যুগে উন্নীত হয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার জন্য বেঁচেছিলেন এবং কাজ করেছিলেন।"

উপরোক্ত মূল্যায়ণটি সার্বিক রবীন্দ্রনাথের, বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য সর্বযুগব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূরূপে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থাপিত করা এবং বিশ্বের কাছে তাঁর বাণী, ভারতের বাণী, যা তিনি নিজেই দেশে দেশে প্রচার করেছেন—তার কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি। কবির ভাষায়, 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।'

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যসংগ্রহ 'সঞ্চিতা' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করার সময় তাঁকে 'বিশ্বকবিসম্রাট' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৌরবের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পারস্য তাঁকে পূর্বাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে অভিহিত করেছিল ; রোঁমা রোঁলা রবীন্দ্রনাথের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন ; উইল ডুরাণ্ট বলেছিলেন, 'আপনি একাই যথেষ্ট কারণ, যার জন্য ভারত স্বাধীন হওয়া উচিত।' ইরাণ, ইরাক, মিশর ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশের রাজারা, জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুভার, ইতালীর রাষ্ট্রপ্রধান মুসোলিনী, সোভিয়েট সরকার এবং বহুরাজ্যের আমন্ত্রণ ও সম্বর্ধনা তিনি পেয়েছিলেন। জাপান এবং চীন তাঁকে ভারতের ভাবীদর্শী কবিরূপে আবাহন

জানিয়েছিলেন, কাজেই ইহা সত্য যে এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত কবি ছিলেন এবং নজরুলের বিশ্ব-কবি-সম্রাট আখ্যাটি সে যুগে হয়তো গ্রহণ করা যেতো।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতি-কবি ছিলেন এবং যে কোন ভাষায় যে কোন কবি গীতিকবিতায় যে শিখরে উঠেছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাকে অতিক্রম করেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো শুধু কবি বা সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন না; তাঁর সর্বতোমুখী কর্মধারা ও কল্যাণচিন্তা শুধু ভারত নয়, বিশ্বমুখীনও বটে।

বিশ্বের দুজন সেরা কবি—ফরাসী কবি হিউগো ও জার্মান কবি গয়টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা যাক্। ভিক্টর হিউগো সম্বন্ধে সমালোচক জে. এ. এম গুড়ন বলেন, "তাঁর সত্যিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সৃজনশক্তিতে এবং তাঁর দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশনে, তবুও কাব্যজগতে তিনি সর্বক্ষণ এক বিশেষ দিগ্‌দর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রহস্যময় ও দার্শনিক কর্মধারা ও আত্মিক অভিজ্ঞতা রাত্রি ও সাগরের উপমার সাংকেতিক প্রকাশে তাঁর সাহিত্যকল্পনা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর সকল প্রচেষ্টার গভীর সমন্বয় সাধিত হয়েছে, তাঁর বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং তাঁর দীর্ঘ, অতিশয় কর্মবহুল জীবনের কাব্য প্রচেষ্টায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ উৎসর্গ আমাদের কাছে এযুগে তুলনাবিহীন বলে মনে হয়।"

গয়টে সম্বন্ধে সমালোচক, এইচ্. এ. ফিলিপস্ বলেন, "তাঁর সমস্ত জীবনের শিল্প প্রচেষ্টা পত্র—স্মরণিকা, লিপিবদ্ধ কথাবার্তা ইত্যাদি যেন একটি বিরাট ভাণ্ডার, যা থেকে বহু লেখক নিজেদের শিল্প কীর্তি রচনা করেছিলেন। সমস্ত প্রাণীজগৎ যে আইনের প্রশাসনে পরিচালিত তাহা আবিষ্কারের অভিপ্রায় তাঁর ছিল। যদিও ধৈর্যশীল ও বাস্তব পরিবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর ছিল, তবুও সৃজনশীল কল্পনা, যুক্তিময় সিদ্ধান্তের পরিবর্তে তাঁকে বিজ্ঞানসাধনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাবিত করত। সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর মূল প্রেরণা ছিল, যে সব অস্তিত্বই একক এবং তাঁর জীবনে ও অন্তকর্মে যথাসম্ভব এই ধারণা প্রতিফলিত হয়েছিল।

আবার, ওয়েমারের মত একটি অতি ক্ষুদ্ররাজ্য ও তার প্রশাসন কি করে ইয়োরোপের সর্বশেষ সার্বজনীন মানুষের বিকাশের পরিবেশ দিতে পেরেছিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।"

গয়টে ইউরোপের শেষ সার্বজনীন মানুষ হতে পারেন কিন্তু আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ সারা এশিয়ার প্রথম সার্বজনীন মানুষ। আবার, সারা ইউরোপে ভিক্টর হিউগোর কোন তুলনীয় ব্যক্তিত্ব না থাকলেও শুধু কাব্য ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য চিন্তা

ও কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হিউগোর সঙ্গে বিশেষ ভাবে তুলনীয়।

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টর ইউগোর 'লা মিজারেবল্' এবং গেটের 'ফস্ট'-এর মতো কোন বিখ্যাত বই লেখেননি, কিন্তু তাঁর গীতি-কবিতা ও কাব্য, তাঁর বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের গানের মধ্যে যেগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল, তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, সাংকেতিক নাটক, চিত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ, বিশ্বসংস্কৃতির সংমিশ্রণের উদ্দেশ্যে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, তাঁর জীবনদর্শন, মানবতাবাদ, যেগুলো মানবজাতির কল্যাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই মহত্বপূর্ণ গুণগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসংস্কৃতি এবং সভ্যতার জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছেন। রোঁমা রোঁলা তাঁর প্রশংসা করেছেন, উইল ডুরান্ট, তাঁর প্রেরণাপূর্ণ আদর্শ এবং পবিত্র প্রভাবের কথা উল্লেখ করে গেছেন এবং মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন।

মহাত্মা গান্ধীর মতে, "রবীন্দ্রনাথ সত্যিকার জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদীও ছিলেন।" তিনি শুধু পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ও প্রকাশ করেননি, তিনি ভারতের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী সারা বিশ্বে সকল মানুষের জন্য প্রচার করেছিলেন; তাই তিনি 'সমাজ পূর্ব ও পাশ্চাত্য' বইতে লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষে মানুষের ইতিহাস সার্থকতার একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করবে, সর্বমানবের সামগ্রিক রূপের একটি অপূর্ব প্রকাশ সাধন করে। ভারতের ইতিহাসের কোন সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নেই, ইহা সর্বমানবের ইতিহাসের সম্পদ হবে।'

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে, 'চীন ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন দেশই প্রাচীন অতীত থেকে প্রবহমান একটি সভ্যতার গর্ব করতে পারেনা।'

ভারতবর্ষে বৈদিকযুগের ধ্যানধারণা এখনও একটা জীবন্ত শক্তি এবং তৎকালীন ঋষিদের মন্ত্রাদি এখনও প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে জওহরলাল নেহেরুর 'ডিসকভারি অফ্ ইণ্ডিয়া' থেকে একটি উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ এই ধারাবাহিক ইতিহাস উপলব্ধিতে আরও সহায়ক হবে। "আমি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকায় মহেঞ্জোদাড়োর একটি টিপির উপর দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার চারিদিকে পাঁচ হাজার বছরের পূর্ববর্তী এই প্রাচীন নগরের রাস্তাঘাট ও বাড়িগুলি রয়েছে এবং তখনও ইহা একটি উন্নত ও প্রাচীন সভ্যতা।" অধ্যাপক চাইল্ড লিখেছেন যে 'সিন্ধুসভ্যতা একটি বিশেষ পরিবেশে মানবজীবনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনের একটি সার্থক উদাহরণ।' এবং ইহা আজও বেঁচে আছে বর্তমান বিশিষ্ট

ভারতীয় সভ্যতায় ও সংস্কৃতির ভিত্তিরূপে। আশ্চর্য ভাবার কথা যে একটি সভ্যতা পাঁচ, ছয় হাজার বছর বেঁচে আছে শুধু অপরিবর্তনশীল হয়ে নয়, কারণ ভারতবর্ষের যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটছিল নানাপথে। এই দেশ ও জনগণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল পারস্য, মিশর, গ্রীস, চীন, আরব, মধ্যএশিয়ার বহুজাতি, মধ্যোপসাগরের তীরবর্তী জাতিসমূহ প্রভৃতি বিবিধ জনসম্প্রদায় ও সভ্যতার সংস্পর্শে। তাঁদের প্রভাব ভারতের উপর পড়েছিল এবং ভারতও তাঁদেরকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি এত সুদৃঢ় ছিল যে তা আজও টিকে আছে।"

মহেঞ্জোদাড়ো যুগ থেকে শিবের পরিকল্পনা ও ধারণা আবহমান কাল প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে পৌঁছেছে। মহান সংস্কৃতকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্যে শিবের স্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শংকরাচার্য শিবের পূজা ভারতের চৌদিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিবের মঙ্গলময় ও রুদ্ররূপ যা নানা প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তা যেমন কল্পনায় উজ্জ্বল তেমনই ভাবে গভীর।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বিভিন্ন যুগের ভাবধারা রবীন্দ্র সাহিত্যে, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বেদ ও উপনিষদগুলি, মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত, বুদ্ধদেব ও অশোকের মহান যুগ ও কর্মধারা, ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম প্রকাশের গুপ্তযুগ, প্রধানতঃ কবি কালিদাস এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যুগ, ভারতীয় শক্তি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগ, মোগল যুগ—তাঁদের চিত্রকলা ও অপূর্ব সৌধনির্মাণশৈলী, রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের ইতিহাস, ভারতে বৃটিশ শাসন, ভারতীয় পুনর্জীবনের নবযুগ, স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইত্যাদি ভারতীয় অতীত যুগগুলির ও বর্তমান যুগের ব্যাখ্যাতা হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতিনিধি। তিনি ভারতের যা মহৎ তা যেমন গ্রহণ করেছেন তেমন সারা পৃথিবীতে মানুষের গান গেয়েছেন এবং প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের সবথেকে প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি এবং সারা পৃথিবীর মানবের পূজারী ও প্রেমিক, তা দেখানোই এই পুস্তকের লক্ষ্য।

"Presented free of cost with
compliments from the Central
Institute of Indian Languages
(Government of India)-
Mysore - 570006."

ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সত্তা

ভারতীয় উপমহাদেশ যার মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, ভারত ও পাকিস্তান এই পাঁচটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে, সেই ভূভাগের গত পাঁচহাজার বছরের স্থল ও জল এবং অধিবাসীদের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি ও সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক রূপ রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভৌগোলিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ অবধি সবদিক রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' রূপে গণ্য করেছেন, যে পবিত্র তীর্থে পৃথিবীর নানাদেশের, নানাজাতের লোক সমাগত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে, যে জাতির লক্ষ্য সমগ্র পৃথিবীর সমন্বয়সাধন, বিচ্ছিন্ন থেকে শুধু স্বদেশের উন্নয়নসাধন নয়, আগ্রাসী নীতি নয়, সর্বদেশের সকল মানুষের একীকরণের স্বপ্ন।

তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করছি :—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

… …

হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুণ দল, পাঠান, মোগল এক দেহে হলো লীন।
পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে,

হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভৌগোলিক ভারতদৃষ্টি চিরন্তন ভারতবর্ষের মনোদৃষ্টি। 'বিষ্ণু-পুরাণ'-এ দেখতে পাই 'সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে দেশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত, সে দেশ জম্বুদ্বীপে সর্বোত্তম। এর কারণ অন্যান্য দেশ আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত, ভারতবর্ষ কর্তব্য সম্পাদনে ব্যগ্র। এমন কি দেবতাদের মধ্যেও এমন ধারণা রয়েছে যে ভারত ধর্মসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, সুতরাং যাঁরা ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা দেবতাদের চেয়েও ভাগ্যবান।'

পুরাণে যে ভারতের বর্ণনা আমরা পাই, তা মহাভারতে আরও বিস্তৃত ও গভীরতর। রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে ভারতের বিগতযুগের মানুষদের মনে যে সামগ্রিক ভারতের ধারণা ছিল তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ভারতের একটি সামগ্রিক ভৌগোলিক মূর্তি রয়েছে—যা পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তরের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি বিস্তৃত। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই একত্বের উপলব্ধি তৎকালীন ভারতবাসীদের ঐকান্তিক কামনা ছিল। ভারতের সামগ্রিক রূপ উপলব্ধির জন্য তীর্থযাত্রা—ভারতের পবিত্রস্থানগুলির দর্শন, অবশ্যকর্তব্য ছিল। ধর্মভক্তির মাধ্যমে সমগ্র ভারতবাসীকে এক সূত্রে বাঁধায় ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল।'

শুধু নদ-নদী, পর্বত ও স্থানবিশেষের চাক্ষুষ পরিচয় নয়। মানসিক একত্ব-বোধের আন্তরিক প্রচেষ্টা ইহাতে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উৎসর্গ' কবিতায় এই ভক্তিভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

"হে বিশ্বদেব মোর কাছে দেখা দিলে কি বেশে
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে, দেখিনু তোমারে স্বদেশে,
ললাট তোমার নীল নভতল।
বিমল আলোকে চিরোজ্জ্বল,
নীরব আশিস সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ।
জাহ্নবী তব হার আভরণ
দুলিছে বক্ষপর।

হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা মোর সনাতন স্বদেশে।"

এই দেশ থেকে বিশ্বে উত্তরণ—ইহা রবীন্দ্র মানসিকতার উদার বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে পাঁচহাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র ও মনোগ্রাহীরূপ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বছর তখন 'প্রকৃতির খেদ' কবিতায় বৈদিক যুগের একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

"দ্যাখ আর্যসিংহাসনে
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দ্যাখ দেখি তপোবনে
কেমন ঈশ্বরধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত
ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠেছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণ চমকিত করি।
সরস্বতী নদীকূলে
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈদিকযুগ থেকে বর্তমান যুগ অবধি নানা যুগের নানা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তাঁর ভারতপ্রেম জাতি-বর্ণ-ধর্ম-অঞ্চল-ভাষা নির্বিশেষে সকলের জন্য। তাই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'র নায়ক গোরার মুখে আমরা শুনেছি "আজ আমি সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ সকলের জাতই

আমার জাত; সকলের অন্নই আমার অন্ন। আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতের কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন—ভারতবর্ষের দেবতা।"

এই ধারণাই তিনি 'সমাজ—পূর্ব ও পশ্চিম' পুস্তকে পুনরাবৃত্তি করেছেন:

"বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমরা আছি, মহা ভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে; একদিন যে ভারতবর্ষ অতীতে অংকুরিত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ।"

রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও লোকহিতৈষণা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, এই প্রেম, এই বিশ্বহিতৈষণা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য।

ইহা উপনিষদের বাণী—'সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, সং বো মনাংসি জানতাম'—'আমরা একত্রে চলব, একসঙ্গে কথা বলব, আমরা সকল মনের ঐক্য উপলব্ধি করব'— রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

তাই যুগযুগব্যাপী প্রবহমান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির রবীন্দ্রনাথ প্রতিভূস্বরূপ।

তপোবনে ভারতীয় জীবনধারা

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগ অরণ্যে—আশ্রমে, তপোবনে, প্রকৃতির কোলে ; বেদ, উপনিষদ এবং রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি তপোবনেই রচিত হয়। সরস্বতী ও সিন্ধু এবং সিন্ধুর শাখানদীগুলির উপকূলে ব্রহ্মাবর্তে, মহান ঋষিগণ বাস করতেন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থেকে যে মহান সত্যগুলি উপলব্ধি করতেন তার কাব্যময়রূপ মানব-সভ্যতার অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয়েছিল তমসানদীর তীরে বাল্মীকি আশ্রমে, আর ভারতীয় বিরাট মহাকাব্য মহাভারত প্রথমে রচিত হয়েছিল নৈমিষারণ্যে।

তপোবনে শুধু সাধনা ও ধর্মচর্চা হতো না, শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। সেখানে গুরুগৃহ থেকে শিষ্যগণ একজন মহান পুরুষের সান্নিধ্যে তত্ত্বজ্ঞান ও বাস্তবজীবনের জ্ঞান লাভ করত। সে সব ব্যক্তিগণ জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করে পঞ্চাশোর্দ্ধে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে আশ্রমে বাস করতেন, সত্যের সাধনায়, ঈশ্বর উপাসনায়, তাঁরাই ঋষি নামে অভিহিত হলেন।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে তপোবন ধীরে ধীরে অপসারিত হলো। কিন্তু এই জীবনাদর্শ ভারতীয় জীবন থেকে একেবারে লোপ পায়নি। এই আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিত্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজ ও গুরুকুল এই আদর্শেই প্রণোদিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তপোবন প্রবন্ধে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন চীন, শক, হূণ, পারসিক, গ্রীক, রোমক সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে...... সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলে গেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনও কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে। কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ

আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে?"

শিক্ষা, তপোবন (১৩১৬ পৌষ)

ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও আদিযুগের সভ্যতার রূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতলক্ষ্মী' কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননী—জননী
নীল সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্রতুষার কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।"

রবীন্দ্রনাথ তপোবনের জীবনধারার একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন তাঁর 'চিত্রা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়—

"অন্ধকারে বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে
অস্তগেছে সন্ধ্যা সূর্য, আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধভার করি আহরণ
বনান্তর হতে, ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে। করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলে লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটির প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে,
শূন্যে অনন্তগগনে ধ্যানময় মহাশান্তি;
নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত।"

আবার প্রভাতের ছবি—একই কবিতায়—

"তপোবন তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত, যত তাপসবালক—
শিশির সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা
প্রাতঃস্নাতঃ স্নিগ্ধছবি আর্দ্র-সিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি, সমুজ্জল কায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গ কাকলি গান,
মধুপগুঞ্জন গীতি, জল কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিতি সুর
শান্ত সামগীতি।"

এই শান্তির মধ্যে দেখি সে যুগের উদার ঋষিদৃষ্টি। যখন ভর্তৃহীন জবালার পুত্র সত্যকাম গুরু গৌতমের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য এসে নিবেদন করল যে তার গোত্র জানা নেই এবং উপস্থিত সকলে বিস্ময়সূচক গুঞ্জন আরম্ভ করল—'কেহ করিল ধিক্কার লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার'; তখন,

'উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চৈতালি' কাব্যে 'তপোবন' কবিতায় সে যুগের একটি সামগ্রিক চিত্র এঁকেছেন:

"মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাছায়া লয়ে,
রাজা রাজ্য—অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নত শিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি—স্রোতস্বিনীতীরে।

মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন,
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্তভালে।',

এই তপোবনের যুগ রয়েছে রামায়ণে, মহাভারতে এবং আমরা দেখেছি বিক্রমাদিত্যের যুগে তপোবনের জীবনধারা অপসৃত হয়ে গেলেও সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতে তপোবনের মহিমা তুলে ধরেছেন।

ভারতের আদি কবি বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে রামায়ণ রচনা করেন। এই পরিবেশে ও পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্মীকি প্রতিভা নাটকে ও বিভিন্ন কবিতায় অপূর্ব সুষমায় প্রকাশ করেছেন।

ঋষিকবি বাল্মীকির মন করুণায় সিক্ত, এমন সময় এক ব্যাধ কামমোহিত ক্রৌঞ্চ দম্পতীর একটিকে তীর মেরে হত্যা করল। ভারতের আদিকবির অন্তর থেকে উৎসারিত হলো ব্যাধের প্রতি অভিশাপ—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীসমাঃ
যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকম অবধীঃ কামমোহিতম্।"

বাল্মীকি যখন করুণায় অভিভূত হয়ে কাব্য রচনায় আকুল, তখন জ্ঞানদাত্রী বীণাপাণি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন—

"আমি বীণাপাণি তোরে শিখাতে এসেছি গান
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ,
যে রাগিনী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিনী তোরই কণ্ঠে বাজিবেরে অণুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে
চারিদিকে দিকবধূ আকুল নয়নজলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্রতারা
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা

যে করুণরসে আজি ডুবিলরে ও হৃদয়
শতস্রোতে তাই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য স্রোত ববে,
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত,
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।"

আবার রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় আমরা দেখি বাল্মীকির ব্যাকুলতা—এই নবলব্ধ ছন্দবোধ তিনি কি কাজে লাগাবেন। নারদ বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে বাল্মীকি বললেন যে মানুষের গৌরবে তিনি তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত করবেন—

"মহাম্বুধি যেইমতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগান্তরে মহামানবের স্তবগান,
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত নিবেদিয়ো পিতামহ পায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এলো, স্বর্গে তাহা দিয়োনা ফিরায়ে
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি, মানুষেরে মোর ছন্দগানে,
ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করেনা অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠোর ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,

মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে আছে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে নিয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে, সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্যনাম
নারদ কহিলা ধীরে, অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

রামায়ণের প্রাণপুরুষ রাম, হিন্দীভাষায় লেখা তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' এখনও শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে সব হিন্দীভাষী অঞ্চলে পাঠ করা হয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু জনপ্রিয় নয়, বাংলা ভাষার গৌরব। দক্ষিণের রাজাগোপালআচারীর ইংরেজী লেখা রামায়ণের গল্পও বিশ্বে আদৃত। মহাত্মা গান্ধী যখন আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন তখনও তাঁর মুখে 'হা রাম, হা রাম'। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রামচরিত্রের মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

বিরাটত্বে, বৈচিত্র্যে, গভীরতায়, আধ্যাত্মিকতায় মহাভারত মহাকাব্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। মহাভারতের রচনাকাল অবধি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিগত সকল যুগের কাহিনী এই মহাকাব্যে রয়েছে ; তাই এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত "যাহা নাই ভারতে (অর্থাৎ মহাভারতে) তাহা নাই ভারতে, (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) ; একথাও প্রচলিত যে, "মহাভারতের কথা অমৃতসমান।"

মহাভারতের রচনাসম্ভার যেমন বিশাল তেমন বিপুল। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ এই মহাভারতে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে রয়েছে গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, ভানুমতী, উত্তরা প্রভৃতির চরিত্র। এই বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র চরিত্রের সকলের যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়েছেন তিনি কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের বাণীই গীতা বা শ্রীমদ্ভগবতগীতা। কৃষ্ণ ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার একথা সেযুগ থেকে এযুগেও অনেকের বিশ্বাস। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' বইয়ে তথ্য ও যুক্তি সহকারে ইহা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। গীতাভাষ্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা যেমন লিখেছেন, শংকরাচার্য যেমন লিখেছেন, তেমন বর্তমান যুগে তিলকের ভাষ্য, গান্ধীজির ভাষ্য ও বিনোবা ভাবের 'গীতাপ্রবচন', যা ভারতের বহু ভাষাতেই অনুবাদ করা হয়েছে, সবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের অনেক কাহিনী তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক, 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'বিদায়-অভিশাপ'

প্রভৃতি কবিতায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

'গান্ধারীর আবেদন' কবিতাটিতে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, গান্ধারী, ভানুমতী, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী প্রভৃতি বহু চরিত্রের সমাবেশ। পুত্র দুর্যোধন অধর্ম আচরণ করে পাণ্ডবদের সপত্নীক বনবাসে পাঠাচ্ছেন তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর আবেদন পাপী পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করার। কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

"দুর্যোধন। প্রণমি চরণে তাত,
ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়
অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ ?
দুর্যোধন। লভিয়াছি জয়।
ধৃতরাষ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী ?
দুর্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।
ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই,
রে দুর্মতি ?
দুর্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ—
জয়, জয়, চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্রসুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি। দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা জয়রস,
ঈর্ষাসিন্ধুমন্থন সঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান—সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী।

আবার,

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।
দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ।
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায় সুহৃদ-রূপে নির্ভর বন্ধন।
কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,"

দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর মনোভাবও অনুরূপ। নানা অলংকারভূষিতা ভানুমতীকে যখন গান্ধারী ভৎর্সনা করলেন যে কুরুবংশের এই দুর্দিনে উল্লাস ও উৎসবের মনোভাব ভাল নয় এবং তা দুর্যোগ ডেকে আনবে, তখন ভানুমতীর উত্তর,

"মাতঃ মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি, কভু জয়, কভু পরাজয়
... ...
দুর্দিন দুর্যোগ যদি আসে
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী—"

গান্ধারীর বহু উক্তির মধ্যে মাত্র কয়েকটি তুলে ধরছি :

"অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র ; স্নেহমোহেভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে,
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্য ধনজনে
ফেলে চলি সেও চলে যাক নির্বাসনে—
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।"

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে অনেক ধিক্কার করেছেন, তবুও তাঁর উত্তর,

"ধর্মবিধি বিধাতার
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যতনিত্য, অয়িমনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তার কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—"

আবার প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের যে গুরুতর অন্যায় ও অত্যাচার দুর্যোধন, দুঃশাসনরা করল, মাতা গান্ধারী তার উল্লেখ করে বলছেন :

"হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদ পাষাণভিত্তি করে দিল দ্রব
লজ্জা, ঘৃণা, করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খলখল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র-পিশাচেরা—ধর্ম জানে

সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব।
... ...
মহারাজ, শুন মহারাজ।
এ মিনতি, দূর করো জননীর লাজ;
বীরধর্ম করহ উদ্ধার; পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন; অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান—ত্যাগ করো
দুর্যোধনে"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করলেন,

"পরিতাপ দহনে জর্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী।"

যখন গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হলো তখন তিনি নিজেকে বললেন,

"হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও, নতশিরে,
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।"

যখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনবাস যাবার পূর্বে গান্ধারীর কাছে বিদায় নিতে এলেন,—

"যুধিষ্ঠির। "আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী
বিদায়ের কালে"

গান্ধারী আশীর্বাদ করলেন—

"সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য, ক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর।
... ...
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ

খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ।
পুত্রাধিক পুত্রগণ, অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণ সিন্ধু করুক মন্থন।"

দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে গান্ধারী বললেন,

"ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী, একবার
তোলো শির, বাক্য মোর কর অবধান,
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য—কলঙ্ক অক্ষয়।
... ...
তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী গেহিনী
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদল প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।"

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' আর একটি অতি সুন্দর কবিতা। পাণ্ডব মাতা কুন্তী বিবাহের পূর্বে জাত, শৈশবে পরিত্যক্ত, পুত্র কর্ণকে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে আনার আগ্রহে কর্ণের কাছে এসেছেন।

শৈশবে পরিত্যক্ত শিশু সাধারণ এক পরিবারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে, তখন মহাবীর কর্ণ, কুরুপক্ষে এক বিখ্যাত সেনাপতি।

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি—কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

কুন্তী। বৎস তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে,
সেই আমি আসিয়াছি ছাড়ি সর্বলাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।
... ...

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে, রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী? এ যে রণভূমি,

আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে?

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে লব মাতৃক্রোড়ে।
... ...
সর্বউচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্ব পুত্র আগে—
জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি।"

কর্ণ কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন,

"যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে করো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
... ...
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে অয়ি
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র ও পরিবেশ আমাদের কাছে বর্তমান যুগে জীবন্তরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

সংস্কৃতে মূল মহাভারত অবলম্বনে কাশীরাম দাস বাংলায় যে মহাভারত লিখেছেন তাও অতি জনপ্রিয় ও বাংলা ভাষার গৌরব।

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।"

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের পর ধীরে ধীরে তপোবন যুগ চলে গেল। এল বিলাসবহুল শহুরে জীবন এবং ক্ষমতাদৃপ্ত রাজন্যবর্গ। প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, গুপ্তযুগ-এ জন্মেছিলেন সেইযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কালিদাস। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক

ও কাব্যগুলিতে—শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ইত্যাদি তপোবন জীবনের উপর শ্রদ্ধা সুপরিস্ফুট, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়।"

সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ নাগরিক সভ্যতার তুলনায় রবীন্দ্রনাথেরও আকর্ষণ ছিল প্রাচীন ভারতের উন্মুক্ত, উদার, শান্ত, সংযত তপোবন জীবনধারার প্রতি। তাই তিনি তাঁর 'চৈতালী' কাব্যে 'সভ্যতার প্রতি' কবিতাটিতে লিখেছেন,

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার—ধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি, পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব,
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই, ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতে হৃদয়স্পন্দন।"

বুদ্ধদেব ও অশোক

শাস্ত্রবিদরা বুদ্ধকে নবম অবতার বলে গণ্য করেন। বিশ্ব-শক্তির বিশেষ প্রকাশ যাঁদের মধ্যে তাঁরাই অবতার। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও পরশুরাম এই ছটি অবতারের কীর্তি-কাহিনী পুরাণাদিতে বর্ণিত হলেও বর্তমান যুগে তাঁদের কোন প্রভাব দেখা যায় না। কিন্তু রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই সপ্তম, অষ্টম ও নবম অবতারের প্রভাব এ যুগেও প্রবল, রামের জন্মতিথি চৈত্রের শুক্লানবমী—রামনবমী ; কৃষ্ণের জন্মতিথি ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী—জন্মাষ্টমী ; বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস, বৈশাখী পূর্ণিমা—বুদ্ধপূর্ণিমা—ভক্তিভরে আজও পালিত হয়।

তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণনির্ভর যে ইতিহাসকে আমরা বর্তমানে ইতিহাস বলি, তার জন্ম খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস ঐ সময়ে ইতিহাস শুরু করেন এবং তাঁকে বলা হয় ইতিহাসের জনক। কাজেই রাম বা কৃষ্ণের যুগে এ ইতিহাস ছিল না। অনেকে বলেন, কৃষ্ণ হয়তো এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের কিছু পূর্বে জন্মেছিলেন, রাম তারও অনেক পূর্বে। ইতিহাসবেত্তারা কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে, এমনও মনে করেন। ইতিহাসে রামের কোন হদিশ নেই। রামের কোন বাণী লিপিবদ্ধ নেই, হয়তো তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্য 'রামায়ণ' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কালিদাসের 'রঘুবংশ', ভবভূতির উত্তররামচরিত'-ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই রামের জীবন কাহিনী আজও ভারতে শুধু নয়, ভারতের বাহিরেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাল্মীকির রামায়ণ প্রভাবিত করেছে পরবর্তী সব লেখককে। অনুবাদ বা অনুকরণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সব উল্লেখযোগ্য ভাষায় রামায়ণ লেখা হয়েছে, ইংরেজি ও অন্যান্য বহু বিদেশী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করা হয়েছে বা রামায়ণের কাহিনী লেখা হয়েছে। গান্ধীজি রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন এবং আততায়ীর গুলিবিদ্ধ হয়ে রাম নাম করতে করতেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণের বাণী আমরা পেয়েছি গীতায়। গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, দর্শনে হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গীতার আলোচনা চলছে যুগ যুগ থেকে। কৃষ্ণকে বলা হয় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—অর্থাৎ পূর্ণ অবতার। আমাদের যুগে কৃষ্ণের এই পূর্ণতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র'-বইয়ে।

শোনা যায় অরবিন্দ যখন বোমার মামলার অভিযোগে আলিপুরের কারাগারে তখন কৃষ্ণের বাণী তিনি শুনতে পান এবং মুক্তি পেয়েই সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলন ত্যাগ করে, সংসার ত্যাগ করে, তৎকালীন ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে তিনি যোগাশ্রম স্থাপন করেন, এবং পরে সারাজীবন ধর্মসাধনায় পৃথিবীর কল্যাণে সাধনা করেন। এ-যুগেও বিনোবাভাবে যে 'গীতা-প্রবচন' রচনা করেছেন তা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

চৈতন্য কৃষ্ণকে ভগবান রূপে পূজা করতেন এবং সারা ভারতের বহুবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ ও বাল্যজীবনে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, লিখেছিলেন। সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধানও রাম বা কৃষ্ণকে বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষেপ করেনি।

কৃষ্ণের বাণী যেমন 'গীতা', বুদ্ধের বাণী তেমন 'ধম্মপদ'। আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ বুদ্ধের জন্মের কাছাকাছি সময় থেকেই তাই রাম বা কৃষ্ণের মত তিনি প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তি নন, তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা আমরা ইতিহাসেই জানতে পারি। এই ঐতিহাসিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে পৃথিবীর সর্বকালের, সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ মানবরূপের মনে করেন।

রাম ও কৃষ্ণের প্রভাব এখনও ভারতীয় জনজীবনে প্রবলভাবে প্রবহমান হলেও বুদ্ধের প্রভাব অনেক সীমাবদ্ধ। সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় ও সিংহলে এখনও বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল কিন্তু তাঁর জন্মভূমি এবং কর্মভূমি এই ভারতবর্ষ হলেও ইংরেজ আমলের পূর্ব ভারতবর্ষ বুদ্ধ ও অশোককে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণবধর্মের প্রসার, বুদ্ধদের মধ্যে হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি বহু দল গড়ে ওঠায়, সংঘগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং চরিত্র-ভ্রষ্টতা এবং সর্বোপরি মুসলমানদের আগমন ভারতে বৌদ্ধধর্মকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিল। এমনকি অশোকের শিলালিপিগুলিতে, প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে কি লেখা তা-ও আমরা পড়তে পারতাম না। ইংরেজ, জেমস প্রিন্‌সেপ, যখন অশোকের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করলেন, তখনই সাধারণ নবজাগরণের সঙ্গে এল বৌদ্ধ ধর্মেরও পুনরুজ্জীবন। "যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৬—১৯০২) বৈদান্তিক ধর্মের পুনরুদ্বোধন ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই সিংহলের দেবমিত্র ধর্মপাল (১৮৬৪—১৯৩৩) বৌদ্ধধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাদানে প্রয়াসী হন। ......কলকাতার 'মহাবোধি সোসাইটি'র ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার (১৯২০) এবং

সারনাথের মূলগন্ধকোটি বিহার প্রতিষ্ঠা (১৯১১), ধর্মপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম,' এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অফ এশিয়া', গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'বুদ্ধ চরিত', নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা পুস্তক 'অমিতাভ', রমেশ চন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা এবং রিস্ ডেভিস্ দম্পতীর গবেষণা ও লেখা ইত্যাদি নানা পুস্তক থেকে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বহু কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা লিখেছেন। তা ছাড়া 'চণ্ডালিকা', 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন', 'মালিনী', ইত্যাদি নাটকে-ও বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান।

অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি ও সর্বমানবের সমতা, প্রধানতঃ, এই কটি নীতিই বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগ-সূত্ররূপে কাজ করেছে। এজন্যই চরিত্রপূজারী রবীন্দ্রনাথ পুণ্যচরিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।"

(প্রবোধ সেন—রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি)

"আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়। একান্ত নিভৃতে যা তাঁকে বারবার সমর্পণ করেছি, তা-ই আজ এখানে উৎসর্গ করি।" আবার, "ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে-দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান, এল তিব্বত, মঙ্গোলিয়া দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ।" এই ঘোষণা বাক্ অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তর মূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে রচনা করলে বুদ্ধবন্দনা মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে,। মানুষ বলেছে, যিনি অলোক-

সামান্য দুঃসাধ্য সাধন করবেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে ; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তাঁরা আঁকলেন ছবি, দুর্বহ প্রস্তর খণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তাঁরা নির্মাণ করলেন মন্দির ; শিল্প প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে শিল্পী, আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।"

—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে বুদ্ধ, অশোক, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও জীবনধারা সম্বন্ধে আরও অনেক সশ্রদ্ধ উক্তি আছে। এবার কয়েকটি কবিতা বা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

(ক) 'বুদ্ধদেবের প্রতি'—(সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত)

"ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।
চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।"

খ) 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি',

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ,
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি।

তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণ-পাণি
তব শুভ সংগীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।"

(গ) "সকল কলুষ, তামস হর, জয় হোক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর নিখিল ভুবনময়,
জ্ঞানসূর্য, উদয় ভাতি ধ্বংস করুক তিমির রাতি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি, অপগত কর ভয়।"

(ঘ) "সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন,—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির,
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

বুদ্ধের বাণী শুধু যে সম্রাট অশোককে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত করেছিল তা নয়, অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যেও একটি অপূর্ব চরিত্র-মাহাত্ম্য দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় এই মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। 'অভিসার' কবিতায় আমরা দেখতে পাই, 'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।' রাত্রে নগরের নটী বাসবদত্তা অভিসারে বেরোলে হঠাৎ তার 'নূপুর শিঞ্জিত পদ' সন্ন্যাসীর বক্ষে লাগলে তিনি চোখ মেললেন। বাসবদত্তা প্রদীপ ধরে দেখল, 'সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান' একপুরুষ; তখন নটী লজ্জিত হয়ে তার ঘরে তাঁকে যেতে আহ্বান জানালো। সন্ন্যাসী বললেন,—'যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী—সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।' বছর না যেতেই বসন্তকালে বাসবদত্তার

নিদারুণ বসন্তরোগ দেখা দিলে "প্রজাগণ পুরপরিখার বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।"

সেই চরম দুর্দশায়—

"সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
চালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দন পঙ্কে।
ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়,
আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি, বাসবদত্তা।"

'পূজারিনী' কবিতায় আমরা দেখতে পাই,

"সেদিন শারদ-দিবা-অবসান, শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়ালো আসি।"

অজাতশত্রু ঘোষণা করেছিলেন বেদ, ব্রাহ্মণ এবং রাজা ছাড়া আর কারোর পূজা করলে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। তাই রাজমহিষী এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সকলে এবং পুরবাসীরাও শ্রীমতীকে সাবধান করে দিলেন। শ্রীমতীর বুদ্ধভক্তি এমন প্রবল যে সন্ধ্যায় সে স্তূপ পদমূলে ভক্তিভরে প্রদীপ জেলে দিল। প্রাসাদের প্রহরীরা এই আলো দেখতে পেলে—

"মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি
মরিবার তরে করিস আরতি?'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী আমি বুদ্ধের দাসী।
সেদিন শুভ্রপাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপাদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।"

'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় আমরা দেখি ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার সাহসিক সেবাব্রত। শ্রাবস্তী নগরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বুদ্ধদেব তাঁর সমবেত শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের মধ্যে কে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বুভুক্ষুদের খাওয়াবার ভার নেবে। ধনী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীগণ কেহই এই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে ভরসা পেলেন না। তখন, ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া, যার নিজস্ব কোনই সম্পদ নেই, এগিয়ে এল। সে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই দায়িত্ব নিতে চাইল। সমবেত সকলে বিস্ময়বোধ করল যে কেমন করে সম্বলহীনা সুপ্রিয়া বুভুক্ষুদের খাওয়াবার দায়িত্ব পালন করবে। তখন সুপ্রিয়া বিনীতভাবে সকলকে নমস্কার করে বলল,

"কহিল সে নমি সবা-কাছে,
শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
'আমি দীনহীন মেয়ে, অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া,—
প্রভু আজ্ঞা হইবে বিজয়া।
আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা'।"

উপরোক্ত কবিতাগুলি ছাড়াও আরও বহুকবিতা, নাটক, বক্তৃতা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং বুদ্ধের আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

অশোক

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যেমন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করতেন, তেমন অশোককে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মনে করতেন; অশোক সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের অভিমতও রবীন্দ্রনাথের অভিমতের অনুরূপ; রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি—

"এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তার কার্যে, মঙ্গলসাধন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি

সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি। সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজন ছিল না, ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশ-জয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে, ইহা মঙ্গল-শক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য, ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সমস্ত রাজ-আড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, কত বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গল শক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে।"

—'ধর্ম', উৎসবের দিন (১৯১৫)

আবার ১৯০৩ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এ 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চেয়েছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়েছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনো কালে মরিবে না, সরিবে না—অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন আবৃত্তি করিতে থাকিবে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতের সেই গৌরবের দিন। কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে।"

অশোকের পঞ্চম শিলানুশাসনে লেখা আছে—"এতায় অথায় অয়ং ধংম লিপি লিখিতাঃ চিরথিতিক ভোতু তথা চ প্রজা অনুবততু" এ ধর্মকথা চিরস্থায়ী হোক এবং তাঁর পরবর্তীলোকেরা এর অনুবর্তন করুক।

এল. পি. স্যাণ্ডারস তাঁর 'ষ্টোরি অফ বুদ্ধিজম্' বইয়ে লিখেছেন—"রাজা অশোকের ধর্মবিজয় অভিযানগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতা বিস্তারের এক মহত্তম প্রচেষ্টা। কারণ এই অভিযানগুলি হয়েছিল তখন অনেক দেশেই যেখানে মানুষ সংস্কারে আচ্ছন্ন ও সভ্যতার আলোক পায়নি এবং প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী লোকদের জীবনে বুদ্ধধর্ম এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল।"

ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁর 'আর্লি হিষ্টোরি অফ ইণ্ডিয়া'য় লিখেছেন—

"এটা সন্দেহের বিষয় যে ঐকালে পৃথিবীর আর কোথাও এমন সুগঠিত সংস্থা ছিল কিনা, এটা যেন পরবর্তী খৃষ্টান করুণা ও দার্শনিকতার পূর্বসত্তা, এতে মহান অশোকের প্রতিভা এবং যে প্রজাপুঞ্জ এই কাজে ব্রতী ছিলেন তাঁদের চরিত্রের মাহাত্ম্যও উপলব্ধি করা যায়—অশোকের মৃত্যুর বহুশতাব্দী পরেও এর কল্যাণময় ফলপ্রসূতা বিদ্যমান রয়েছে।"

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে অশোক' প্রবন্ধে লিখেছেন—"এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে অশোক শুধু বৌদ্ধ সমাজের প্রতিভূ ছিলেন না, বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ নির্বিশেষে তিনি স্বরাজ্যে সকল প্রজারই প্রতিভূ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একথা তাঁরই নির্দেশে উৎকীর্ণ বিভিন্ন শিলানুশাসনে অক্ষয়লিপিতে আজও বিরাজমান রয়েছে।

'দেবানাং পিয়ে পিয়দসি রাজা সবপাসংডানি চ পবজিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি, দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে, ন তু তথা দানং ব পূজা ব দেবানাং পিয়ো মাংঞতো যথা কিতি সারবতী অস সবপাসংডানং'—দ্বাদশ শিলানুশাসন। এর অর্থ 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) প্রব্রাজিত ও গৃহস্থ সর্বসম্প্রদায়কেই পূজা করেন (অর্থাৎ সম্মাননা করেন), দানের দ্বারাও অন্য বিবিধ উপায়েই পূজা করেন। কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেরূপ মহাকার্য বলে মনে করেন না, যে রূপ মনে করেন সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধিসাধনকে।' বস্তুতঃ সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি সাধনের চেয়ে মহত্তর কর্ম আর কি হতে পারে? অশোক শুধু মানুষ নয়, পশুদের কল্যাণ-সাধনকেও কর্তব্য বলে মনে করতেন, যিনি মানুষ ও পশু উভয়েরই কল্যাণ-বিধানে তৎপর হয়েছিলেন, তিনি যে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধিসাধনে ব্রতী হবেন তা বিচিত্র নয়।"

অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি, যা তাঁর 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তা এই—"এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্রধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন, শিলাস্তম্ভে। এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনোদিন দেখা দিয়েছে।"

অশোকের ষষ্ঠ শিলানুশাসনে লেখা রয়েছে—'নাস্তি হি কমং তরং সর্বলোক হিতৎ পা'—অর্থাৎ সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নেই।' পঞ্চম শিলানুশাসনে লেখা আছে—'কল্যাণং দুকরম যে আদিকরো কলাণস স দুকরং

করোতি।' অর্থাৎ 'কল্যাণ ত্বকর, যিনি আদি কল্যাণকৃৎ তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন।' এই দুঃসাধ্য কর্মের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে,…
বেগ তার ব্যাপ্ত হলো চারিভিতে
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে, মন্দিরে, মূর্তিতে।"

'পরিশেষ', সিয়াম, প্রথম দর্শনে (১৯২৭)

১৯০৪ সালে হিলডা সেলিগম্যান নামে একজন ইংরেজ লেখিকা মৌর্য যুগের কাহিনী অবলম্বনে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'When the Peaccocks Called' প্রকাশ করেন। এই জনপ্রিয় বইখানির ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন বম্বের হিন্দ্‌ কিতাব। লেখিকার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লেখেন। এর বাংলা অনুবাদ এইরূপ—"এই ভ্রাতৃহত্যার যুগে যখন পৃথিবীর বহুলাংশে বুদ্ধির অমানবিকতা চলছে, তখন মহান আদর্শ উপলব্ধির জন্য যে শান্ত পরিবেশ প্রয়োজন তা সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। মহারাজ অশোকের মহান মানবিকতার সংগঠনের দিকটি প্রকাশ করার প্রয়াস করেছেন এই লেখিকা। প্রাচীন ভারতের বাণী, যার আজও চিরন্তন মূল্য রয়েছে, সাহসের সঙ্গে তা উপস্থাপিত করার জন্য তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।"

বুদ্ধ ও অশোকের মহত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বাণী সম্ভবতঃ তাঁর শেষ বাণী। ১৯৪০-এ এই বাণী, ১৯৪১-এর ৭ই আগষ্ট, তাঁর মৃত্যু।

কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য

অশোকের যুগ আর বিক্রমাদিত্যের যুগের ব্যবধান কয়েকশ বছরের। মৌর্যরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল এবং শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে সৈন্যপরিদর্শন কালে তাঁরই সেনাপতি, পুষ্যামিত্র শুঙ্গ, তাঁকে সৈন্যদের সামনে হত্যা করল। তারপর প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ভারতে অশান্তি চলছিল এবং কণিষ্ক ও খারবেলার মত উল্লেখযোগ্য শাসক থাকা সত্ত্বেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলেই যাচ্ছিল। অবস্থা আরও খারাপ হলো যখন বিদেশীরা ব্যাকটিরিয়ান গ্রীক, শক এবং হুণেরা—আঘাত হানতে লাগল। গুপ্তযুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, দেশে এল স্থিতিশীলতা, প্রগতি ও সমৃদ্ধি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের যুগে গুপ্তদের গৌরব-সূর্য মধ্যগগনে। কালিদাসের আবির্ভাব এই বিক্রমাদিত্য যুগেই তাঁর রাজত্ব কালে, (৩৭৬—৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। কালিদাসের ঠিক কতকাল বেঁচেছিলেন জানিনা। মৌর্যযুগের মহিমা অবসানের পর গুপ্তযুগে ভারতে সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির যে যুগ এল, সেই যুগকেই প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। শিল্প, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন প্রসার ঘটল যে অনেক পণ্ডিতেরা গুপ্তযুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ বা ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ডঃ কে, এম মুন্সীর মতে, ভারতের এই স্বর্ণযুগে সুখ, শান্তি, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতা যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনটি আর কখনও দেখা যায় নি।

ডঃ দেবস্থলীর মতে, 'গুপ্তযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কালিদাস, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন। কালিদাস ছিলেন একজন সাদাসিধে ব্রাহ্মণ, শিবভক্ত এবং এক বিচিত্র প্রতিভা। নিঃসন্দেহে সংস্কৃত সাহিত্যে, কাব্য ও ছন্দে, সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক বিশ্বসাহিত্যের সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম। এছাড়া, তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোর্বশী' এবং মহাকাব্য 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' এবং গীতিকবিতা 'মেঘদূতম্',—এই সবই সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নরূপে স্বীকৃত। গুপ্তযুগের সাহিত্যে আরও অনেক বিশিষ্ট লেখকদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

'কিরাতার্জুনীয়ম্'-এর লেখক ভারবি, 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর লেখক শূদ্রক, এবং

'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের রচয়িতা বিশাখাদত্ত—এঁরা সকলেও এই যুগকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

গল্পসাহিত্য ও কথা-কাহিনীতে বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', গুণাঢ্য-র 'বৃহৎকথা বিশেষ' উল্লেখযোগ্য। গদ্যলেখায় শ্রেষ্ঠস্থানীয় দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' এবং 'দশকুমার চরিত'-ও এই যুগেই লিখেছিলেন। বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক রচনায় গুপ্তযুগে বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। অভিধান রচনায় অমরসিংহ, চিকিৎসাবিদ্যায় ভাগভট্ট অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র ও ফলিত বিজ্ঞানে বরাহমিহির তাঁর 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' লিখেছিলেন, যা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় বাইবেল স্বরূপ বলা হয়। গণিতে আর্যভট্টকে ভারতের নিউটন বলা হয়; তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় কতকগুলি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করেছিলেন।

ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে 'কাত্যায়নস্মৃতি', 'দেবলস্মৃতি' এবং 'ব্যাসস্মৃতি' এই যুগেই সংকলিত হয়েছিল। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কয়েকটি পুরাণও সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। মহাকাব্য মহাভারতও সম্ভবতঃ এই যুগে পুনরায় সম্পাদিত হয়েছিল।

দর্শনক্ষেত্রে ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা'-য় সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যা করলেন; বসুবন্ধু রচনা করলেন 'পরমার্থসপ্ততি'। ন্যায়সূত্রের সূত্রপাত করলেন পক্ষীলস্বমিন্। আর বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগাচার্য্য, এই যুগের ভূষণ। গৌড়পদ, যাঁকে শংকরাচার্য্যের গুরুর গুরু বলা হয় এবং একেশ্বরবাদী বেদান্ত দর্শনের প্রবর্তক, তিনিও এই যুগেরই মনীষী-সন্তান।

"বেদ-উপনিষদ এবং রামায়ণ-মহাভারত বাদ দিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছে গৌরবান্বিত বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস এই তিনজনের জন্য। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে এই তিনজন যে মহৎ অর্ঘ্য লাভ করেছেন, প্রাচীন ভারতের আর কেউ তা পান নি

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সেই বলেছিলেন—

জগতে যত মহৎ আছে,
হইব নত সবার কাছে

—'মানসী', 'দেশের উন্নতি'
(১৮৮৮)

আর জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসেও বলেছেন—

'তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।'

—'জন্মদিনে'

সংস্কৃতে প্রচলিত প্রবাদ 'কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ'। সংস্কৃত ভাষার এই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রথম যুগের কথা আমরা জানতে পারি তাঁর এই উক্তি থেকে—"মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ-কাব্য আমি যে রকম পড়লুম, দ্বিতীয় আর কেউ তেমন করে পড়েনি।"

কালিদাসের তপোবনের জীবনধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তাই তিনি লিখেছেন—

"ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, তখন চীন, শক, হূণ, পারসিক, গ্রীক সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। ·········সেদিনকার ঐশ্বর্য্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলে গেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে?"

কলিদাস ছিলেন শিবভক্ত। এই কালিদাসকে, এই শিবভক্তকে, অপূর্ব রূপচ্ছটায় রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, তাঁর 'মানসলোক' কবিতায়—

"মানসকৈলাস শৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দিরপ্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস—
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধনীলাভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,

জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে,
আজিও মানসধামে করিছ বসতি,
চিরদিন রবে সেথা, ওহে কবিপতি,
শংকর-চরিত-গানে ভরিয়া ভুবন।
মাঝে হতে উজ্জয়িনী-রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্ন সভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্নক্ষণপ্রভা
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি—
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি ॥"

রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, নাটকে ও প্রবন্ধে ক্ষণে-ক্ষণেই শিবের বিচিত্র বিভূতি প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে :—

"হে, রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধবক্ ধবক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হা-হা ধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। ......নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। এই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজন ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।"

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পাগল' (১৯০৪)

'নটরাজ' নাট্যকাব্যে, নটরাজ শিবকে গুরু সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।...
মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।...
জীবনমরণ নাচের ডমরু,
বাজাও জলদমন্দ্র হে
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিতবিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥"

তৎকালীন ভারতকবি কালিদাস যেমন অলকাপুরী থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাম ও নগরীর বর্ণনা করেছেন তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে, তেমনই বর্তমান যুগের ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতায়, বিশেষতঃ জাতীয়সংগীত হিসেবে যে গানটি গৃহীত হয়েছে, তাতে বর্তমান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের ব্যক্তিজীবনের সুখ, দুঃখ, বেদনা এবং তাঁর কাব্যের অমৃতধারার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কাব্য' কবিতাটিতে—

"তবু কি ছিলনা তব সুখ-দুঃখ, যত
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরি মতো
হে অমর কবি? ছিল নাকি অনুক্ষণ
রাজসভা—ষড়চক্র, আঘাত গোপন
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রুর···
··· ··· ···
তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোন ঠাঁই
দুঃখদৈন্য-দুর্দিনের কোন চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান॥"

গুপ্তযুগ ও মোগল যুগের মধ্যবর্তীকাল

এই হাজার খানেক বছর ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের অবক্ষয়ের কাল। অন্যদিকে নব-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠান, আফগান ও তুর্কীদের ধীরে ধীরে ভারতে প্রাধান্য বিস্তার।

ভারতে বিভিন্ন সময়ে কোন কোন রাজবংশ রাজত্ব করলেও সমগ্রভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন সাম্রাজ্য ছিল না। এই আত্মকলহে লিপ্ত রাজাদের একে একে পরাজিত করে দিল্লীর সুলতানরা ৭১১ খ্রীঃ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভারতের বহুলাংশে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। তারপর এলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর। মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তারের পূর্বে থানেশ্বর ও কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এবং বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএন-সাং-এর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন বড় যোদ্ধা এবং রাজা হিসেবে তাঁর ছিল বিবিধ বিষয়ে, যেমন, শিল্পকলা, ধর্ম ইত্যাদিতে, আগ্রহ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সমুদ্রগুপ্ত ও অশোকের মত হর্ষবর্ধনও বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। হর্ষবর্ধনের চরিত্রকার বাণভট্ট সংস্কৃতে বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ 'কাদম্বরী'-ও লিখেছিলেন।

'কাদম্বরী' গদ্যকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সংস্কৃত লেখকদের মধ্যে চিত্রময় রচনায় বাণভট্টের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। ছবির পর ছবি তুলে ধরে বাণভট্ট তাঁর 'কাদম্বরী'র গল্প লিখে গেছেন। এ লেখার গতিশীলতা নেই, কিন্তু এ লেখার প্রতিটি চিত্র যেন স্বর্ণখচিত।"

গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী, উজ্জয়িনী, ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হয়ে গেল এবং কনৌজ প্রাধান্য লাভ করল। বাংলার পালবংশ প্রায় চারশত বৎসর ভারতবর্ষের বহুলাংশে রাজত্ব বিস্তার করেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃষ্টাব্দ) কনৌজ দখল করে সেখানকার রাজা ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর মনোনীত চক্রায়ুধকে ঐ সিংহাসনে বসালেন। সমগ্র উত্তর ভারত জয়ের পর ধর্মপাল কনৌজে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দরবার করলেন—যে দরবারে ভোজ, মৎস, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার রাজ্যের রাজারা সমবেত হয়ে মাথা নত করে ধর্মপালের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন।

অধ্যাপক মাইতি বলেন, "শুধু বঙ্গরাজ্য জয়ের গৌরবই তাঁর ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মেরও তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধের বিক্রমশীলা বিহার, ওদন্তপুরী ও সোমপুর বিহারও তৈরী করিয়েছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হরিভদ্র এই যুগের লোক। অন্যান্য বিখ্যাত পণ্ডিত এবং লেখকদের মধ্যে ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণি দত্ত এবং ভবদেব ভট্ট।"

এই পাল যুগেই বাঙালী জাতি এবং ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। ধর্মপালের যুগেই বাংলা ভাষার আদি পুস্তক 'চর্যাপদ' ইত্যাদি রচিত হয়েছিল।

বঙ্গদেশে পালদের পরে সেন রাজত্ব শুরু হয়েছিল। এই যুগেই ব্রাহ্মণ্যপ্রধান হিন্দুধর্মের আবার পুনরুজ্জীবন হল আর বল্লালসেন প্রবর্তন করলেন কৌলিন্য প্রথা, যা বাঙালী সমাজে দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। বিখ্যাত 'গীতগোবিন্দ'-এর কবি জয়দেব এবং 'পবনদূত'-এর লেখক ধোয়ী ও অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ লক্ষ্মণসেনের রাজদরবারকে বিভূষিত করেছিলেন। সেনযুগের দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক ঘটনা, বক্তিয়ারখিলজী কর্তৃক সেনদের এক রাজধানী, নবদ্বীপ, দখল।

উত্তরভারতে আর কয়েকটি রাজবংশ ছিল—প্রতিহার, গহরওয়ালা, দিল্লী ও আজমীরের চাহমানা, কাশ্মীরের কারাকোটা এবং কালাচুড়ি ও চান্দেলারা। প্রতিহারদের নাগভট্ট আবার আক্রমণকারীদের এমন আঘাত হেনেছিলেন যে তারা তিনশ বছর যাবৎ সিন্ধুদেশের মরুভূমির বাইরে আসতে পারে নি। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ভোজ।

চৌহানদের রাজা, তৃতীয় পৃথ্বীরাজ, ভারতের শেষ হিন্দু রাজা, যিনি দেশ রক্ষার জন্য আক্রমণকারী মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরেরমৃত্যু বরণ করেছিলেন।

কনৌজের রাজা যশোবর্মণ (৭২৫—৭৪০ খৃষ্টাব্দ) ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করলেন। অতি শীঘ্রই এই সাম্রাজ্য ভেঙে গেল এবং কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের আধিপত্যে চলে গেল। সংস্কৃত সাহিত্যে 'উত্তররামচরিত'-এর কবি ভবভূতি রাজা যশোবর্মণের সভাকবি ছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন যে, 'যতকাল সংস্কৃত সাহিত্য বেঁচে থাকবে ততকাল সংস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভবভূতির সঙ্গে যশোবর্মণের নামও বেঁচে থাকবে।'

কাশ্মীরের কারকোটা বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' মুক্তাপীড়ের গৌরবময় কাজের প্রশস্তি। ললিতাদিত্যের

পরে অন্তর্বিরোধে কাশ্মীর দুর্বল হয়ে পড়ল এবং ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের অধিকারে চলে গেল।

সিন্ধুর রাজা দাহিরই ভারতের প্রথম হিন্দু রাজা যিনি মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের শেষ হিন্দু রাজা লাল্য কিন্তু বিশ্বাসঘাতক এক মুসলমানের হাতে নিহত হন।

মহম্মদ আবদুল করিমের লিখিত 'ভারতে মুসলীম রাজত্বের ইতিহাস' প্রথম ভাগের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত, এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিচিত্র, বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশঃ পুরাণ-উপপুরাণে শতধা বিভক্ত; ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্র-লাঙ্গুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে, সমাজে, শাস্ত্রে কোন বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না, সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই। সে সময় নূতন সৃষ্ট মুসলমান জাতির বিশ্ববিজয়োদীপ্ত নবীন বল সম্বরণ করিবার কোন একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না।"

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীতে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে একটি অহমিকাপূর্ণ সংকীর্ণ মনোভাব দেখা দিয়েছিল। তারা বিশ্বাস করতে লাগল তারাই ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় জাতি এবং অন্য জাতির লোকেরা তাদের সঙ্গে মিশবার উপযুক্ত নয়। বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আল্-বেরুণী গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠ করেছিলেন। তিনি অবাক হয়ে লিখেছিলেন, "হিন্দুরা বিশ্বাস করত তাদের দেশের মত আর দেশ নেই, তাদের জাতির মত আর জাতি নেই, তাদের রাজার মত আর রাজা নেই, তাদের ধর্মের মত আর ধর্ম নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত আর বিজ্ঞান নেই।"

এই যুগে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে একটা অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। নীতিবোধ ও ন্যায়সংগত আচরণের উৎস, ধর্মেও, বিকৃতি দেখা দিল। বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক শংকরাচার্য্য হিন্দুধর্মকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা করেও এই দুর্বলতাগুলি দূর করতে পারেন নি। বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও কাশ্মীরে বামামার্গ ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই ধর্মমতের অনুসারীরা মৎস্য, মাংস, মদ্য এবং নারীতে আসক্ত হয়ে থাকত। তারা শুধু 'খাও-দাও-আনন্দ করো' এতেই

আনন্দবোধ করত। একটি লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছিল তৎকালীন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্রমশীলায়, যখন দেখা গেল যে এক বৃদ্ধসাধিকা একটি ছাত্রকে এক বোতল মদ্য সরবরাহ করেছে; যখন শাস্তি প্রয়োগের কথা হোল তখন কর্তৃপক্ষের মধ্যেই বিরোধ দেখা দিল। এতেই বোঝা যায় যে দেশের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও এই বামামার্গের কি প্রভাব পড়েছিল। ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেরা আলস্য ও বিলাসিতায় দিন কাটাত। এমনকি মঠগুলি যা একসময়ে জ্ঞান ও ধর্মের পীঠস্থান ছিল তা এখন বিলাসের ও অলসতার আশ্রয়স্থল হোল। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুও ব্যাভিচারী হয়ে উঠল। আর একটি কুপ্রথা হোল দেবদাসী প্রথা। প্রত্যেক বিখ্যাত মন্দিরে অবিবাহিতা বহু মেয়েকে দেবদাসী নিযুক্ত করা হোত। এর ফলে মন্দিরে মন্দিরেও ব্যাভিচার দেখা দিল।

অত্যন্ত অশ্লীল তান্ত্রিক সাহিত্য এ-যুগে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র 'সময় মাত্রকা' বলে একখানা বই লিখেছিলেন, এ বইটি হোল এক বারবনিতার আত্মকাহিনী। এই বইতে দেখি সেই বারবনিতার সমাজের প্রতি স্তরে গমনাগমন ঘটেছে—কখনো নটী, কখনো ধনীর রক্ষিতা, কখনো রাস্তায় রাস্তায় লোক জোগাড়, আবার কখনো মিথ্যা বৌদ্ধ-সাধিকা সেজে যুবকদের নষ্ট করা আর ধর্মস্থান অপবিত্র করা।

গজনীর মামুদ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন তখন ভারতবর্ষের এই অবস্থা। এর ফলেই এল মুসলমান প্রাধান্য। ইয়ামিনি বংশ থেকে লোদী বংশ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর মুসলমানরা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকল। এরপর এল বিখ্যাত মোগল যুগ।

রবীন্দ্রনাথ সর্বমানুষের ভ্রাতৃত্ব এবং সর্বমানবের কল্যাণে বিশ্বাসী ও আগ্রহী ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ, গোঁড়ামি যাতে মানুষের দুঃখ সৃষ্টি হয়, তা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই এই মধ্যযুগে রবীন্দ্রনাথের মন আকৃষ্ট হয়েছিল শক্তিশালী শাসকদের দিকে নয়, বরং রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদের প্রতি।

কবীরের জন্ম হয়েছিল বারাণসীতে, ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি পেশায় মুসলমান জোলা আর ধর্মে রামানন্দের শিষ্য; কবীর বলতেন, "ঈশ্বর এক—আমরা তাঁকে আল্লা বা রাম যাই বলি না, হিন্দুদের ঈশ্বর বাস করেন বারাণসীতে আর মুসলমানদের আল্লা মক্কায়, আর যিনি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি বাস করেন মানুষের মনে—মন্দিরে বা মসজিদে নয়।" জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু এবং

মুসলমানরাও কবীরের শিষ্য ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দোঁহার কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন।

কবীর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে মুক্তির পথ ঈশ্বরে ভক্তি এবং মানবে ভালবাসা। তাই তিনি ভজন করতেন এবং সব রকমের ধর্মীয় ভণ্ডামির নিন্দা করতেন। নিম্নলিখিত দোঁহাটি কবীরের মনোভাব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছে— "আল্লা যদি মসজিদে থাকেন তাহলে বিশ্বের স্রষ্টা জগদীশ্বর কোথায় থাকবেন? রাম যদি মূর্তির মধ্যে থাকেন তাহলে বাইরের বিশ্বের খবর রাখবে কে? পূর্বে দেখো হরি আর পশ্চিমে আল্লা। নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাকাও সেখানে তুমি করিম এবং রাম উভয়কেই পাবে, পৃথিবীর সব নর ও নারী ঈশ্বরেরই জীবন্তরূপ। কবীর আল্লারও সন্তান, রামেরও সন্তান। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর, তাই জাতিতে-জাতিতে ব্যবধান বৃথা, সব রঙই আলোকচ্ছটা, মানুষের স্বভাবের সব বৈচিত্র্যই মনুষ্যত্বের অংশ। ঈশ্বরের উপাসনা শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার নয়, যাদের অন্তরে ভক্তি আছে তারা সকলেই ঈশ্বরকে আরাধনা করতে পারে।"

কবীরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন, শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, গুরু নানক। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন এবং সর্ব ধর্মে সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করতেন।

দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারত দক্ষিণের মালভূমির দক্ষিণে অবস্থিত, এবং ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী এদের পৃথক করে রেখেছে। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলকে বলা হোত তামিলকম্। এই অঞ্চলের চরিত্র এবং ইতিহাস সাধারণতঃ উত্তর ভারত থেকে স্বতন্ত্র।

দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত রাজবংশ সে যুগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাদের নাম—বকটক, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব এবং চোল। অধ্যাপক ডুব্রেভিল মন্তব্য করেছেন, দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল রাজবংশ ছিল তাদের মধ্যে বিখ্যাত বকটকদের দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশেরই উপর আধিপত্য নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চালুক্য বংশের দ্বিতীয় পুলকেশী ঐ বংশেরই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজা

ছিলেন। বিখ্যাত জৈন কবি, রবিকীর্তি, দ্বিতীয় পুলকেশীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

রাষ্ট্রকূটদের রাজা, ধ্রুব, প্রায় সর্বাংশে আধিপত্য লাভ করেছিলেন। ঐ বংশেরই রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কিছুদিনের জন্য উত্তর ভারতেরও কিছু অংশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পল্লবদের শাসন একটি স্বর্ণযুগ ; নানাদিকে সাহিত্যিক বিকাশ ঘটেছিল। সংস্কৃত ভাষাকে তাঁরা খুবই সমাদর করতেন এবং তাঁদের অধিকাংশ দলিলপত্র সংস্কৃতে লেখা হোত। নরসিংহবর্মণ (৬৩০—৬৬৮ খ্রীঃ) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। সংস্কৃত গদ্যের বিখ্যাত লেখক দণ্ডী এই যুগে বাস করতেন। বিখ্যাত প্রাচীন তামিল গ্রন্থ 'তামিলকুরল'-ও পল্লব যুগেই রচিত হয়।

পল্লবদেরই এক সামন্ত, বিজয়, চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজেন্দ্র চোল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর পিতা রাজরাজ, বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর শৈব মন্দিরটি স্থাপন করেন ; এই মন্দিরটিকে তামিল ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা হয়। রাজেন্দ্র চোল চালুক্যদের রাজা প্রথম সোমেশ্বরকে পরাস্ত করেন। রাজেন্দ্রের দুঃসাহসিক অভিযান হোল পূর্ব ভারতে প্রবেশ। চোল বাহিনী কলিঙ্গ ও বস্তারের ভেতর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করে। এই জয়যাত্রায় চোলবাহিনী ধর্মপাল, রণশূর এবং গোবিন্দচন্দ্রকেও পরাস্ত করল। অবশেষে তারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হোল। এই জয়ের পরে তাঁর পদবীর সংগে যুক্ত হোল 'গঙ্গাইকোদক'। অর্থাৎ 'গঙ্গাবিজয়ী' উপাধি।

রাজেন্দ্রের অভিযান এখানেও শেষ হোল না, তাঁর জয়যাত্রা আরও এগিয়ে নেবার জন্য তিনি শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজা শৈলেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান পাঠালেন ; শ্রীবিজয় রাজ্য তখন মালয়, জাভা, সুমাত্রা এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দ্বীপে বিস্তৃত ছিল। শ্রীবিজয়ের রাজা রাজেন্দ্রের অধিরাজত্ব স্বীকার করেছিলেন।

"Presented free of cost with the compliments from the Central Institute of Indian Languages (Government of India)- Mysore - 570006."

আকবর ও শাজাহান

গুপ্তযুগের পুনরুজ্জীবনের পর ভারতে দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবন এল মোগল যুগে। মোগলদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আকবর। আকবরের ধর্মমত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদে রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধ যুগের অশোকের মত মোগলসম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের চিন্তা করিতেছিলেন। এই জন্যই সেসময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধুর ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।"

গতানুগতিক ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আকবর বললেন যে মানুষের বিবেক ও যুক্তি, ধর্মের একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যে সকল ধর্মমতের প্রতি সমান সহনশীল ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে গোঁড়া ধর্মের জেহাদ নিয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে তখন তিনি ব্যথিত হলেন। তাঁর সাম্রাজ্য থেকে ধর্মীয় বিরোধ দূর করবার জন্য তিনি তাঁর জানা সব ধর্মমতের সমন্বয়সাধন করে এই ধর্মের নাম দিলেন 'তাওয়াজিদ-ই-লাহী' অথবা 'একেশ্বরবাদ'। এই ধর্মের মূল ভিত্তি হল সুলাই-ই-কুল অর্থাৎ সর্ব ধর্মের প্রতি সহনশীলতা। সম্রাট নিজে যে সকল ধর্মাবলম্বীদের মতামত শুনেছিলেন তার ভাল দিকগুলো নিয়ে এই নূতন ধর্মমত গড়ে তোলা হল। এই ধর্মের মূল বিশ্বাস ছিল যে সকলেরই ঈশ্বর এক, এবং হিন্দু, জৈন ও পারসী ধর্মবিশ্বাসের অনেক মূল্যবান সূত্র এই ধর্মে বিশেষ স্থান পেল।

এই নূতন ধর্মের নামকরণ হল 'দীন-ইলাহী'। আবুল ফজল ছিলেন এই ধর্মের প্রধান পুরোহিত, এবং পরস্পরের সম্ভাষণ ছিল 'আল্লা হো আকবর'।

আকবরের আদর্শবাদ, স্বভাবলব্ধ গুণাবলী, চরিত্রের সরলতা এবং নানাক্ষেত্রে সাফল্য পৃথিবীর মহান শাসকদের মধ্যে তাঁর স্থান করে দিয়েছে। মধ্যযুগে ভারতের সব শাসকদের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন তিনি। তাঁর মহান দেশপ্রেম,

বুদ্ধিগত উৎকর্ষ। দুর্লভ আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সমাবেশ তাঁকে ভারতের মুসলমান শাসকদের সকলের ঊর্দ্ধে তুলে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক স্মিথ সত্যই বলেছেন, "আকবর ছিলেন জন্মগত মানুষের রাজা এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত শাসকদের মধ্যে তাঁর ন্যায্য স্থান ছিল।"

আকবরের পৌত্র শাজাহানের ঝোঁক ছিল জাঁকজমক এবং সুদৃশ্য সৌধাদি নির্মাণে। শাজাহানের আদেশে তৈরী সৌধগুলি মুগল শিল্প ভাস্কর্য্যের মহত্তম নিদর্শন। দিল্লীতে সাদা মার্বেলের রাজপ্রাসাদগুলি সহ লালকেল্লা, জামা মসজিদ, মোতি মসজিদ, দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস ইত্যাদি ভারতে মুসলিম ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। অপূর্ব শিল্পসুষমামণ্ডিত বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন, দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর নানাবিধ মূল্যবান রত্নখচিত হয়ে, তৈরী করতে সময় লেগেছিল সাত বছর। এর উপর বিশ্ববিখ্যাত কোহিনূর শাজাহানের রাজদরবারের ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক ও শোভা বৃদ্ধি করেছিল।

ভাস্কর্যের ঐ সকল নিদর্শনেরও ঊর্দ্ধে উঠেছিল শাজাহানের তাজমহল। তাঁর প্রিয় পত্নী মমতাজের স্মরণে রচিত এই স্মৃতিসৌধটি সাদা পাথরে তৈরী এবং সমগ্র কোরাণ কালো পাথরের উপর ক্ষোদিত। এই তাজমহল সারা বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'শাজাহান'। সম্রাটের প্রেমের নিবেদন 'তাজমহল'-এর উপর অতুলনীয় প্রশস্তি—

"একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা,
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন।
সন্ধ্যারক্ত রাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশা
হীরা মুক্তা মাণিক্যের ছটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক'

শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল,
এ তাজমহল।"

এই কবিতারই আরেকটি স্তবক,

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত,
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে,
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য দূত যুগ যুগ ধরি,
এড়াইয়া কালের প্রহরী,
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে সমগ্র 'শাজাহান' কবিতাটি শাজাহানকে এবং তাজমহলকে যেন আরও এক নতুন অমরত্বের দিকে এগিয়ে নিয়েছে।

রাজপুত, শিখ ও মারাঠাগণ

মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। এই পরিকল্পনার মূল ছিল বিচক্ষণ আত্মস্বার্থ বোধ, গুণ ও যোগ্যতার স্বীকৃতি এবং ন্যায়বোধ। আকবর প্রথম বয়সেই বুঝেছিলেন যে তাঁর মুসলিম কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থসাধনে যতটা আগ্রহী সম্রাটের স্বার্থে ততটা নয়, কারণ তাঁরা অনেকেই বিদেশী এবং অর্থ ও ক্ষমতার লোভেই সম্রাটের চাকুরী নিয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যে বিদ্রোহ কতিপয় মুসলিম রাজকর্মচারীদের। কাজেই তিনি মুসলিম সমর্থনের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা সমীচীন মনে করেননি। স্বার্থান্বেষী মুগল, উজবেক, ইরাণী, বা আফগান অমাত্যদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে তিনি রাজপুতদের সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই নীতি অনুসারে অম্বরের রাজা ভারমল-এর বশ্যতা স্বীকার মেনে নিলেন। তিনি ভগবন্ত দাস ও মানসিংহকে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করলেন এবং শীঘ্রই দেখতে পেলেন যে তাঁর উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মচারীদের তুলনায় এই রাজপুতেরা অনেক বেশী কাজের এবং তাদের আনুগত্যও অনেক বেশী। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন এবং দিল্লীর সুলতানেরা যেমন রাজপুতদের বিধর্মী ও নিম্নতর মনে করতেন তিনি তা করতেন না। রাজপুতানা দখলের যুদ্ধেও তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মত মূর্তি ভাঙ্গা বা মন্দির ধ্বংস করেননি। বাস্তবে রাজপুতদের মধ্যে উচ্চতম পরিবার-গুলিকে তিনি আত্মীয় মনে করতেন এবং বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। ফলে যে রাজপুতরা দিল্লীর তুর্কো-আফগান সম্রাটদের সঙ্গে তিনশ পঞ্চাশ বছর যাবৎ কঠোর যুদ্ধে নিয়ত লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা মোগল সম্রাট আকবরের মহাসমর্থক হয়ে উঠলেন, এবং সারা ভারতে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করলেন। আকবরের রাজত্বে রাজপুতদের দান অকুণ্ঠ ও প্রচুর—যুদ্ধে, রাজনীতিতে, শাসনকার্যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজপুতানার দান অসামান্য। রাজপুতদের সহযোগিতায় মোগল শাসন শুধু নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী হলো না, অভূতপূর্ব আর্থিক সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন

এবং হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মহামিলন সাধিত হলো বহুক্ষেত্রে—এসকল মোগল সাম্রাজ্যের অমূল্য অবদান।

তৎকালীন পৃথিবীতে সব থেকে ধনবান ও শক্তিশালী সম্রাট হলেও আকবর কিন্তু রাজপুতনার মেবারের রাণা উদয়সিং ও তাঁর পুত্র রাণা প্রতাপসিংকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেননি। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা রক্ষা, অসীম সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য রাণা প্রতাপের নাম ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

রাজপুত জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে। 'পণরক্ষা' কবিতাটিতে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের জন্য প্রাণদান-ও যে তুচ্ছ ব্যাপার তা দেখানো হয়েছে। যখন মারাঠা সৈন্যদের হাতে বিনাযুদ্ধে 'আজমীর গড়' দুর্গটি ছেড়ে দেবার জন্য মাড়োয়ারের রাজা দুর্গেশ দুমরাজকে নির্দেশ দিলেন, তখন দুর্গাধিপতি দুমরাজের মনে এই দ্বন্দ্ব দেখা দিল—

"আজমীর গড় দিলা যবে মোরে পণ করিলাম মনে,
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে ছাড়িব না এ জীবনে,
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায় ভাঙিতে হবে কি আজ?
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিঃশ্বাস দুর্গেশ দুমরাজ।"

মাড়োয়ার রাজের এই নির্দেশে রাজপুত সেনারাও ক্ষুব্ধ হলো। আর দুর্গেশ দুমরাজ এই দ্বন্দ্ব মেটাতে নিজের প্রাণ দিলেন।—

"রাজপুত সেনা সরোষে সরমে ছাড়িল সমর সাজ,
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম-মাঠ-পারে,
মারাঠা সৈন্য ধুলা উড়াইয়া আসিল দুর্গদ্বারে।
'দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান—ওঠো, ওঠো, খোলো দ্বার'
নাহি শোনে কেহ; প্রাণহীন দেহ সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে বিরোধ মিটাতে আজ,
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ দুর্গেশ দুমরাজ।"

'হোরিখেলা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ রাজপুত জীবনের আর একটি দিক তুলে ধরেছেন। ভূনাগের রাণীর কোটা শহরটি পাঠানরা দখল করে নিয়েছে। রাণী এক ফন্দী করে পাঠানদের নেতা কেসর খাঁকে সহচরসহ হোরিখেলায় নিমন্ত্রণ পাঠালেন রাজপুতানীদের সঙ্গে।

"পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে

কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রাণী,
'লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানি।"
"পত্র পড়ে কেসর উঠে হাসি,
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
... ...
কেতনপুরে রাজার উপবনে
তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি।
মুলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি।
এলো তখন একশো রাণীর দাসী
রাজপুতানি করতে হোরিখেলা।"

দুপুর গড়িয়ে গেল, রাণী তখনও এলেন না; তাই কেসর খাঁর সব বেসুরো মনে হচ্ছিল। অবশেষে রাণী যখন এলেন—

"কেসর কহে, 'তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কাণা।'
রাণী কহে, 'আমারও সেই দশা।'
একশো সখী হাসিয়া বিবশা
পাঠানপতির ললাটে সহসা
মারেন রাণী কাঁসার থালাখানা।
তারপর,
বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হলো নারী লজ্জা ছেড়ে,
একশত বীর ঘিরল পাঠানেরে।"
... ...

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।"

শিখগণ

শিখ কথাটির অর্থ শিষ্য। গুরু নানকের শিষ্যরা শিখ নামে অভিহিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুরু নানক যখন ধর্মের ভিত্তিতে শিখ সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তখন এই সম্প্রদায় শুধু একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ই ছিল। গুরু নানক মূর্তিপূজার বিরোধী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন; তিনি জাতিভেদ প্রথা ও মোল্লা-পুরুতদের আধিপত্যের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে আত্মসংযম, সৎকাজ এবং প্রার্থনাই আধ্যাত্মিক পথ, মুক্তির পথ। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, 'গুরু গ্রন্থসাহেব' সম্পাদনা করেন, এবং শিখদের সংঘবদ্ধ করেন। সম্রাটপুত্র খুরসভ যখন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, গুরু অর্জুন তাঁকে সমর্থন করেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে গুরু অর্জুনকে কারারুদ্ধ করে, জাহাঙ্গীরের আদেশে, নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয়। আওরঙ্গজেবের সময় অত্যাচার ও নিপীড়ন তুঙ্গে উঠল। তিনি শিখ মন্দিরগুলি ভেঙ্গে দেবার এবং শিখদের উপহারাদি গ্রহণকারীদের শহরগুলি থেকে তাড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন। নবম গুরু তেগবাহাদুর, প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলে তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে তাঁকে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে বলা হলো। তিনি অস্বীকার করায়, পাঁচদিন নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হলো। আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি, ও জবরদস্তি করে শিখদের মুসলমান করার চেষ্টায় শিখদের গুরুতর ক্ষোভ জন্মাল এবং তেগবাহাদুরের পুত্র শিখদের দশম গুরু, গোবিন্দ, সমগ্র শিখসম্প্রদায়কে একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করলেন। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন, নাম দিলেন খালসা। এবার শিখদের লক্ষ্য হলো মুসলমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানো। শিখদের এই সংঘবদ্ধতা, ভয়হীনতা ও আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বন্দীবীর' কবিতায়—

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
... ...

'অলখ নিরঞ্জন'—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয় ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্ঝন
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল, 'অলখ নিরঞ্জন'।
এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ।
জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর এসেছে সে একদিন ॥
দিল্লীপ্রাসাদ কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।"
আবার, "সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাতশত চলে পশ্চাতে, বাজে শৃঙ্খলগুলি।
... ...
পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহি শত বীর শত শির দেয় ডারি ॥

সপ্তাহ শেষে সাতশত শিখের প্রাণদানের পর বন্দার হাতে তাঁর কিশোর পুত্রকে তুলে দেয়া হলো নিজহাতে হত্যার জন্য। বন্দা তখন একটুও বিচলিত না হয়ে শিশুর বুকে ছুরি বসিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

"সভা হলো নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি' একটি কাতর শব্দ,
দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ।"

মারাঠাগণ

মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী ধর্মপ্রাণা মাতা জীজাবাঈকে দেবীর মত ভক্তি করতেন এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাঁর শৈশব থেকেই। দাদাজি কোণ্ডদেব

শিবাজীকে শাস্ত্র-পুরাণাদি শেখান। শিবাজী প্রথম থেকেই স্বাধীনচেতা ও সাহসিক কর্মে আগ্রহী ছিলেন।

শিবাজীর মাওয়াল অঞ্চলে জন্ম; সে অঞ্চলটিতে ছিল অনেক ছোট পাহাড় এবং সমতল ভূখণ্ড এবং ছোট ছোট দুর্গ, যেগুলি প্রায়ই হাতবদল হত। শিবাজীর সাহসিকতায় ও মাওয়ালী সৈন্যদের সহযোগিতায় শীঘ্রই এগুলি শিবাজীর দখলে এল এবং রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা তাঁর মনে এল।

শিবাজীর জন্ম ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৬৮০-তে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল সারা দেশে হিন্দু ও মারাঠা শক্তির প্রসার। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবও তাঁকে দমাতে পারেননি। দিল্লীতে মোগল কারাগার থেকে কৌশলে পলায়ন ও মোগল সেনাপতি আফজল খাঁ, শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতিকে হত্যা ঐতিহাসিক ঘটনা। মৃত্যুকালে শিবাজীর রাজ্যে দুশো চল্লিশটি দুর্গ এবং সাত কোটি টাকা রাজস্ব ছিল। হিন্দু হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন, এবং ধর্মপুস্তক, সে কোরাণ হলেও, তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করতেন, এবং নারীর মর্যাদাও তিনি দিতেন অকুণ্ঠভাবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ সরদেশাইর মতে, শিবাজী তাঁর দৃষ্টি শুধু মহারাষ্ট্রেই নিবদ্ধ রাখেন নি, সারা ভারতের হিন্দুদের স্বাধীনতাও তাঁর দৃষ্টিতে ছিল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দেই তিনি দাদাজি নরস প্রভুকে লিখেছিলেন 'হিন্দভিসমাজ'-এর কথা, যার উদ্দেশ্য সারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের স্বাধীনতা লাভ।

'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর এই স্বপ্নের কথা লিখেছেন—

"কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজ
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি'।"

এই কবিতার উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো

'জয়তু শিবাজি'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালী, একসঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ' প্রবন্ধে লিখেছেন "শিখ ইতিহাসের সহিত মারাঠা ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠা জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন; তিনি দেশ জয়, শত্রুবিনাশ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা-কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।

গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি-কামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহাতে রণ-নৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য। কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পাথেয় তারা এখানেই খরচ করিয়া ফেলিল। ইহার পর হইতে কেবল লড়াই ও রাষ্ট্রবিস্তারের, ইতিহাস।......আর যে মহারাজ (রণজিৎ সিং) কৃতকার্য্যতার আদর্শস্থল, তিনি শিখদের মধ্যে কি রাখিয়া গেলেন? অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা।"

ভারতে য়ুরোপীয়দের আগমন ও বৃটেনের প্রাধান্য স্থাপন

পর্তুগাল থেকে ভাস্কো-দে-গামা জলপথে ভারতে আসার পথ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। কাজেই পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এবং তারাই সর্বশেষে ভারত ত্যাগ করেছে। ১৯৪৭-এর আগষ্টে বৃটিশ ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, ফরাসীরাও কিছুদিন পরেই তা করে। কিন্তু পর্তুগীজরা তাদের গোয়া, দমন, দিউ, এই পর্তুগীজ-শাসিত অঞ্চলগুলি ছাড়তে রাজী না হওয়ায় যুদ্ধ করে তাদের হটিয়ে দিতে হলো।

পর্তুগীজরা বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করলো বঙ্গদেশের হুগলীতে, শাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে বসার প্রায় শখানেক বছর আগে। হুগলীকে মূল কেন্দ্র করে পর্তুগীজরা ভারতের নানাস্থানে এবং চীন, মলাক্কা ও ম্যানিলায়ও ব্যবসা চালাত। সপ্তগ্রাম বন্দরটিকে তারা ধ্বংস করল। ব্যবসা ছাড়া সামুদ্রিক দস্যুতা ও মানুষ ধরে তাদেরকে দাস হিসেবে বিক্রয় করাও তারা করতে লাগল। নদীকূলবর্তী সমগ্র পূর্ববাংলায় তারা লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাত। শাজাহানের আমলে কাসিম খাঁ বাংলার শাসক ছিলেন। সম্রাট তাঁকে নির্দেশ দিলেন পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দেবার জন্য। পর্তুগীজরা ইতিপূর্বে দুর্গ তৈরী করেছিল এবং সব জাহাজে শুল্ক আদায় করত। কাসিম খাঁ পর্তুগীজদের তাড়িয়ে বাংলায় তাদের আধিপত্য ও অত্যাচারের অবসান ঘটালেন, এর পরে তারা পশ্চিম ভারতের গোয়া, দমন, দিউ থেকে ব্যবসা চালাত। পরে এলেও, সামান্য ব্যবসা থেকে শুরু করে ইংরেজ ও ফরাসীরা শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করল। ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল পণ্ডিচেরী, আর শাখাকেন্দ্র ছিল মৌসলিপত্তম, কারিকল, মাহে, সুরাট, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে। ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল মাদ্রাজ, বম্বে ও কলকাতায়, আর শাখাও ছিল অনেক। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিবদমান দল বা ব্যক্তিদের একপক্ষে ইংরেজ থাকলে অন্যপক্ষে ফরাসীরা থাকত। শেষকালে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হলো সারা ভারতে, আর ফরাসীরা সামান্য কটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো।

ইংরেজদের এই প্রাধান্য লাভের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক

ডডওয়েল বলেছেন, "ইংরেজদের এই পূর্ণ বিজয়ের প্রধান কারণ সমুদ্রপথে নৌশক্তির প্রবল প্রাধান্য।...বৃটিশরা বাংলাদেশ থেকে খাদ্য ও অর্থ পেত, য়ুরোপ থেকে লোক পেত, এবং উত্তর ভারতের ইংরেজশাসিত অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য পেত ; ফরাসীরা য়ুরোপ থেকে স্থলপথে অতিকষ্টে অতি সামান্য সাহায্য পেত। তাই ইংরেজদের ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছিল আর ফরাসীরা ক্রমান্বয়ে দুর্বলতর হয়ে পড়ছিল, এজন্যই বৃটিশ সেনাপতি কুট, ফরাসী সেনাপতি লালীকে পণ্ডিচেরীর চৌহদ্দির মধ্যে ঠেলে দিতে পেরেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে।"

এ অবস্থা ১৭৫৩-এর শেষে তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের পর। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীতে বঙ্গবিজয় ইংরেজদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি করেছিল। এ সম্বন্ধে জি. বি. ম্যালেসন বলেছেন—"এমন যুদ্ধ কখনও হয়নি যার ফল হয়েছিল বিশাল, তাৎক্ষণিক অথচ দীর্ঘস্থায়ী। এই যুদ্ধজয়ের পরদিন থেকেই ইংরেজরা বাংলা, বিহার উড়িষ্যার প্রকৃত প্রভুত্ব পেল। এর পরেই উত্তমাশা অন্তরীপে কর্তৃত্ব স্থাপন, মরিশাস বিজয় এবং মিশরে নিয়ন্ত্রণভার এল।" পলাশীর জয়ের পর তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ জয়ের ফলে ইংরেজরা ভারতে সব থেকে শক্তিমান হয়ে উঠল। তারপর শখানেক বছরের মধ্যে শুধু ভারতে সার্বভৌম শক্তি নয়, সিংহল (বর্তমানে শ্রীলংকা) ও ব্রহ্মদেশও তাদের অধীনে এলো।

এইভাবে রাতারাতি বণিকেরা রাজা হয়ে বসল, তাই 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশ বছর পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দেখা দিল এক মহাবিদ্রোহ—প্রথম ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে, তার পরে অন্যান্য অনেক ভারতীয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যোগ দিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানাভাবে বহু ভারতীয়কে

তাদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে জবরদস্তি, শোষণ ও নিপীড়ন বেড়েই চলছিল। তাছাড়া ভারতীয় রাজন্যদের নানাভাবে রাজ্য দখল করা হচ্ছিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর 'ডকট্রিন অফ্ ল্যাপস্' যার ফলে নিঃসন্তান রাজাদের রাজ্য কোম্পানীর দখলে চলে যেত ; আরও নানাভাবে বিভিন্ন রাজ্য কোম্পানীর দখলে আনা—এই সব নানাকারণে বহু ভারতীয় বিদেশীদের অত্যাচারমূলক শাসনের অবসান চাইছিল। সিপাহীদের অসন্তোষের নানাবিধ কারণ ছিল এবং তার সঙ্গে এই সাধারণ অসন্তোষ মিশ্রিত হয়ে এক মহাবিদ্রোহ শুরু হল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজদের আখ্যায় এটা 'সিপাহী বিদ্রোহ' আর অনেকের মতে এ-সংগ্রাম স্বাধীনতা লাভের জাতীয় সংগ্রাম। এর পূর্বেও কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটেছিল কিন্তু তা এত ব্যাপক ছিল না, শুধু সিপাহীরা নয়, এ যুদ্ধে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ, নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপী। সকলে মিলে মোগল সম্রাটদের বংশধর তৎকালীন দিল্লীর রাজা বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে মেনে নিলেন। কাজেই এটা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নিল।

এই বিদ্রোহ শুরু হলো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। বঙ্গদেশের ব্যারাকপুরে সিপাহীরা চর্বি মাখানো (হয়তো শূকর বা গরুর চর্বি) গুলি ব্যবহার করতে আপত্তি জানালো এবং মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক ব্রাহ্মণ সিপাই তাদের বাহিনীর এডজুট্যাণ্টকে আক্রমণ করে হত্যা করল। পাঞ্জাব ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল এবং সবথেকে গুরুতর রূপ নিল বিহার, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও দিল্লীতে এবং চম্বল ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। যুদ্ধের সময় সিপাহীরা ও অন্যান্য ভারতীয় সংগ্রামীরা অনেক নিষ্ঠুর ও অমানবিক অত্যাচার করল এবং শাসকেরা যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধজয়ের পর প্রচণ্ড অত্যাচার ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এ সংগ্রাম প্রায় অবদমিত হলো।

ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে এ-যুদ্ধকে 'জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলা উচিত। তাঁর মতে সংগ্রাম সাধারণতঃ অল্প লোকই করে থাকে—তাতে জনগণের সক্রিয় সমর্থন কম বা বেশী হলেও, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ফরাসী-বিদ্রোহ ও এরূপই ছিল। ডঃ সেন মনে করেন যে যখন একটা বিদ্রোহ দেশের বেশ একটা বৃহদংশের সমর্থন পায় তখনই তাকে জাতীয় সংগ্রাম বলা চলে। সিপাহীদের বিদ্রোহরূপে শুরু হলেও এর একটা জাতীয় ও রাজনৈতিক চরিত্র এলো, যখন মীরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লীর রাজা বাহাদুর শাহের কর্তৃত্ব মেনে নিল

এবং বহু ভূস্বামী ও জনসাধারণ বাহাদুর শাহকে সমর্থন জানালো। বিদ্রোহীরা বিদেশী সরকারের অবসান ঘটিয়ে, আগেকার স্বাধীন যুগে ফিরে যেতে চাইল, এবং মোগল সম্রাটদের বংশধর দিল্লীর রাজা বাহাদুর শাহকে মেনে নিল। বাহাদুর শাহ অবশ্যই স্বাধীন মোগল যুগের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি-স্থানীয়।

ভারতে ইংরেজদের প্রধান্য লাভ ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে মনীষী কার্ল মার্কসের অভিমতের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—"ইংরেজরা কিভাবে ভারতে আধিপত্য স্থাপন করলো? মহান মোগলদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করল রাজপ্রতিনিধিরা; রাজপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করল মারাঠারা, মারাঠাদের ক্ষমতা ধ্বংস করল আফগানরা; এভাবে সবাই যখন ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত, ইংরেজরা তখন ঢুকে পড়ল আর সবাইকে নত করল, সারা দেশটা শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, বর্ণে বর্ণে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, জাতিভেদে বিভক্ত এবং পরস্পরের প্রতি বিরূপ অথচ কোনক্রমে একত্রে বাস করছে; এরকম একটা দেশ ও সমাজ বিধাতার বিধানেই বাইরের আক্রমণে বিজিত হবে নাকি?"

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"সিপাহীরা যে অত্যাচার করছে তা সত্যই ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর ও অবর্ণনীয়। এ-সব দেখা যায় জাতিতে-জাতিতে দ্বন্দ্বে, দেশে-দেশে যুদ্ধে এবং সর্বোপরি ধর্মদ্বন্দ্বে। সংক্ষেপে বলতে গেলে মর্যাদা-সচেতন ইংরেজ জাতি যে কাজ প্রশংসা করত, যেমন ভেনডিয়ানসদের ব্লুদের উপর অত্যাচার, স্পেনিশ গেরিলাদের তথাকথিত অবিশ্বাসী ফরাসীদের উপর অত্যাচার, সার্বিয়ানদের জার্মান ও হাঙ্গেরিয়ান প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার···ইত্যাদি। সিপাহীদের আচরণ যতই নিন্দনীয় হোক, এটা ইংলণ্ডের ভারতবাসীর উপর আচরণেরই প্রতিফলন। এটা পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্য প্রসারের সব সময়ই, এমনকি সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনের গত দশ বছরেও, পরিকল্পিত নিপীড়নও এই শাসনের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। মানুষের ইতিহাসে প্রতিশোধ অবশ্যই আছে এবং ইতিহাসের এটাই নিয়ম যে এই প্রতিশোধের পন্থা উৎপীড়ক-ই তৈরী করে, উৎপীড়িত নয়।"

এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমিত হলেও ভারতে বৃটিশ শাসনের মূলে নাড়া দিয়েছিল। কাজেই কিছু করা জরুরী মনে করে বৃটিশ সরকার মহারাণীর ঘোষণা বলে কয়েকটি নীতি ঘোষণা করল। কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসনের ভার বৃটিশ সরকার নিজ হাতে নিল। ১৮৫৮র ১লা নভেম্বর, এই 'মহারাণীর ঘোষণা' অনুসারে ১৮৫৯-এ একটি আইন পাশ হয় এবং এতাবৎকাল বৃটিশ সরকার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল তা দূর করে বৃটিশ

সরকারই সম্পূর্ণ একক দায়িত্ব নিল। ভারতের গভর্ণর জেনারেল এখন থেকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি-ও হলেন।

রাণীর ঘোষণায় প্রকাশ করা হলো যে বৃটিশ সরকার ভারতে আর কোন রাজ্য দখল করবে না। এদেশীয় রাজন্যদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো যে তাঁদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা হবে। আরও ঘোষণা করা হলো, "আমাদের প্রজাগণ যে জাতি বা যে ধর্মেরই হোক না কেন তাদের শিক্ষা, সক্ষমতা ও নিষ্ঠা অনুসারে যে সরকারী পদের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত হবার অধিকার থাকবে।" এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' আইন পাশ করা হলো।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-র ৯ই মে। তাঁর মেজদা, সত্যেন্দ্রনাথ, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সর্বপ্রথম ভারতীয়; রবীন্দ্রনাথের জন্ম ভিক্টোরিয় যুগে; যে যুগ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথান যুগের মতই আর একটি গৌরবময় যুগ।

ভারতে পুনরুজ্জীবন

খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে ভারতে এক পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, গুপ্তযুগে—যে যুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। পূর্বে চীন ও পশ্চিমে পারস্য, রোম ও গ্রীসের সঙ্গে যোগাযোগে ভারতে এমন একটি নব অভ্যুদয় ঘটেছিল যা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তুলনাবিহীন। জ্ঞানবিস্তারে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে নানাদিকে এমন উন্নতি হয়েছিল যে ঐতিহাসিকেরা এই যুগকে গ্রীসে পেরিক্লিসের যুগ অথবা ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথান যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ডঃ কে. এম. মুন্সী বলেন, "গুপ্তসম্রাটরা একটা প্রবল জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতীক হয়েছিলেন, জীবন এমন সুখের, সর্বক্ষেত্রে এমন সৃজনশীলতা—যা আমরা ভারতের এই প্রথম স্বর্ণযুগে দেখি, তেমনটি আর কখনও হয়নি।" মোগল যুগে হয়েছিল দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের তৃতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটে য়ুরোপীয়ানদের, বিশেষতঃ ইংরেজদের সংস্পর্শে। চতুর্দশ শতকে ইতালী থেকে যে পুনরুজ্জীবন সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের পুনর্জাগরণ যেন তারই সম্প্রসারণ। ইতালীয় পুনরুজ্জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পুনরুদ্ধার। সেজন্য জেগে উঠল ঐতিহাসিক চেতনা এবং যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান। মুক্তবুদ্ধির জিজ্ঞাসু মনোভাব, স্বচ্ছদৃষ্টি এবং প্রাচীন সভ্যতার প্রতি বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা। তাই প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের অনুসন্ধান ও অনুধাবন, এই নবজাগরণের প্রধান লক্ষ্য। এই অনুসন্ধানের প্রথম ফল—ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দেশে স্যার চার্লস উইলকিনস্-এর ইংরাজীতে গীতার অনুবাদ (১৭৮৫)। বহুভাষাবিদ স্যার উইলিয়াম জোনস্ ১৭৮৪-তে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন, ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য। তিনিই প্রথম বিশ্বের সমক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারের কথা জানালেন; তিনি বললেন, 'সংস্কৃত ভাষা গ্রীক থেকে আরও পরিণত, লাতিন থেকে আরও সমৃদ্ধ এবং ঐ দুই ভাষা থেকেই অধিকতর পরিশীলিত'। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ-এর মতে ইতালীয় পুনর্জাগরণের যুগ থেকে সারা বিশ্বের পক্ষে আর কিছু তেমন অর্থবহ নয় যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার।"

যেমন্ প্রিন্সেপ্ প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা অশোকের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করলেন ; মহামতি অশোকের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী, জনহিতৈষণা, ধর্মবিজয় ইত্যাদি মহৎ চিন্তা ও কর্মের কথা জানা গেল এই শিলালিপিগুলিতে। ঐতিহাসিকগণ তাই অশোককে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে চিহ্নিত করলেন।

স্যার জন মার্শাল, তাঁর সহকারী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আবিষ্কার করলেন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার অতি প্রাচীন সভ্যতা, যা তৎকালেও (তিন হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দ) উন্নত ছিল।

শিক্ষা-প্রসার, ডেভিড হেয়ার, ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন, আর ডি. রোজিও শেখালেন স্বাধীন চিন্তা। ম্যাকস্‌মূলার প্রকাশ করলেন অনুবাদের মাধ্যমে 'দি সেকরেড্ বুক্‌স্ অফ দি ইষ্ট'—যার মধ্যে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি ছিল। সিলভাঁ লেভির 'থিয়েটার ইণ্ডিয়েন' (১৮৯০)-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজদের আগমন ও য়ুরোপীয় সভ্যতার কল্যাণকর দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্ত-প্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত। দেখা যাক্ তার স্বরূপটা কি ? একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে—শুধু তাই নয়, সমস্ত জগতে যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে, সেইখানটাই সে অধিকার করিয়াছে। কিসের জোরে ? সত্য সন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাত-প্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি।...প্রতিদিন সে জয় করেছে জ্ঞানের জগৎকে, কারণ তাহার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।"

ভারতবর্ষ মধ্যযুগে যে ঘুমের ঘোরে ছিল, তা থেকে এবার জেগে উঠল, ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা অবহিত হলো এবং জাতীয় জীবনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য এগিয়ে এলেন অনেক অসাধারণ ব্যক্তি—যাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রাজা রামমোহন রায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে রামমোহন ভারতে নবযুগের প্রবর্তক। "তাঁর জন্মকালে ভারত তাঁর অতীত গৌরবভ্রষ্ট ; ধর্মের মহান সত্যগুলি বিস্মৃত, যুক্তিহীন আচরণ তখন জাতিকে পিষে ধরেছিল, জীবন অবস্থার দাস হয়ে উঠেছিল। সামাজিক আচরণে, রাজনীতিতে, ধর্ম ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের চলছিল

অবক্ষয়। মানবত্ব তখন নিগৃহীত, অপমানিত। এই পরিবেশে জন্ম হলো রামমোহনের, ভারতের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল তারকারূপে—আত্মা তাঁর অজেয় বীরত্বে পরিপূর্ণ, দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, পবিত্র, ঋষিকল্প। সারা দেশে তার আলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি আমাদের মুক্ত করলেন দীন আত্মবিস্মৃতি থেকে। তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্ব, তাঁর আপোষহীন স্বাধীনচিত্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত করে তুলল সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টায় এবং তা আত্মোপলব্ধির কঠিন কাজে নিয়োজিত হলো। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান পথপ্রদর্শক, তিনি দূর করলেন আমাদের প্রগতির বিপুল বাধাগুলিকে এবং আমাদের মনকে এগিয়ে নিয়ে চললেন মানুষের বিশ্বজনীন সহযোগিতার পথে।"

(ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন, "একদিন যে সময়ে য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য হঠাৎ আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়া আমাদের দেশের নূতন ইংরেজী শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্বল বাংলা গদ্যেও তিনি উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়, ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ হইতে তাহার সার সংকলন করিয়া স্বদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে, বিশ্বধর্মে, বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তার সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন। এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের মধ্যে যাত্রা করেই আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া পৃথিবীর জ্ঞানীসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে। এমনি করিয়াই নিজের সম্পদে মাথা তুলিতে পারিলেই আমরা বিশ্বমানবের জ্ঞানশালায় নিঃসংকোচে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারি।"

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি লেখেন—

"হে রামমোহন আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার

মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান,
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব,
এনে দিক উদ্বোধন; এনে দিক শক্তি অভিনব।"

ভারতের নবজাগরণে, বিশেষতঃ বাংলায়, আর এক বিরাট ব্যক্তি ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত। 'চারিত্রপূজায়' বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ, একাগ্র, একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমি যদি অদ্য তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, কারণ বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে তিনি বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে,—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন। তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।" তাঁর মহান কীর্তিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ—

(ক) তিনি বাংলা গদ্যের জনকরূপে খ্যাত।

(খ) তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল; বিধবাদের উপর হিন্দু সমাজের যে অন্যায়-অত্যাচার ছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তিনি বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণ করলেন এবং বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ করালেন।

(গ) তিনি ইংরেজী শিক্ষা এবং নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

তাছাড়া যে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও পড়াশুনার অধিকার ছিলনা সেখানে এই অন্যায় বাধা-নিষেধ দূর করে অব্রাহ্মণের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিলেন। তিনিই প্রথম নিঃসহায় পরিবারগুলির জন্য "হিন্দু ফ্যামিলী এন্যুয়িটি ফাণ্ড" প্রতিষ্ঠা করলেন। নবজাগরণের বিশিষ্ট কবি ও

দিনে তিনি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। উদারতা, মানবতা ও করুণার আরও এত উদাহরণ আছে যার জন্য 'বিদ্যাসাগর'-কে, 'করুণাসাগর'-ও বলা হয়।

রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিলাসবহুল জীবন ও বদান্যতার জন্য তাঁকে বলা হতো প্রিনস্ দ্বারকানাথ। সবরকম প্রগতিমূলক কাজে দ্বারকানাথ রামমোহনকে সহায়তা করতেন—তা সতীদাহ নিবারণই হোক, অথবা এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনাই হোক। রবীন্দ্রনাথের পিতা, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথের পুত্র হলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি রামমোহনকেই অনুসরণ করতেন। তাঁর ঋষিসুলভ আচরণের জন্য তাঁকে মহর্ষি বলা হোত। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

রামমোহন নবজাগরণের প্রথম পথিকৃৎ হলেও ধর্মজগতে নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব। রামমোহন ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি। রামকৃষ্ণের পাণ্ডিত্য ছিল না, কিন্তু তাঁর ঈশ্বর উপলব্ধি ঘটে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মা কালীর পূজা করে। তিনি প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের নানা পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহান সাধক। তাঁর শিষ্যরা সারা বিশ্বে তাঁর মতবাদ প্রচার করে চলেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলি প্রচার করতেন। তাঁর উপদেশাবলী সংকলিত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-তে, সত্যই অমৃতবাণী। রামকৃষ্ণের প্রথম শতবার্ষিকীতে এই কবিতাটি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"

রামকৃষ্ণের বিখ্যাত শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দ, নবভারতের এক মহান নির্মাতা। প্রথম তিনি খ্যাতিলাভ করেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোতে বিশ্বসম্মেলনে। হিন্দুধর্মকে পুতুল পূজার ধর্ম হিসাবেই বিদেশে মনে করা হতো। এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যখন তিনি বেদান্তের বাণী, রামকৃষ্ণের বাণী শোনালেন তখন সমবেত

সকল ধর্মবিশেষজ্ঞগণ নবীন সন্ন্যাসীর এই বাণীতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। শুধু ধর্মপ্রচার নয়, জাতি-বর্ণ-অঞ্চল নির্বিশেষে তিনি সারা ভারতকে জাগিয়ে তুলেছিলেন এক জাগরণী মন্ত্রে।

একদিন জীবে দয়ার কথা উঠলে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি দয়া করতে কে, বল জীবে প্রেম।" এই জীবে প্রেম, যা সম্রাট অশোকের যুগে ভারত থেকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ভারতের এই নবজাগরণের যুগে নূতনভাবে দেখতে পাই রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির চিন্তাধারায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, লক্ষ লক্ষ লোককে পথের নির্দেশ দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে।

ভগ্নী নিবেদিতার সমাজসেবা, গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন, সুভাষচন্দ্রের দেশসেবা ও সমাজবাদ—এ সবের প্রেরণা বিবেকানন্দের বাণী। বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন' গঠন করেন—এর মধ্যকেন্দ্র বেলুড় থেকে শাখা স্থাপন করা হয়েছে শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নয়, পৃথিবীর বহু দেশে। শুধু ধর্মপ্রচার নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসার এবং আর্তের সেবা ইত্যাদি এই মিশনেরই কাজ। সর্বধর্ম সমন্বয়ও রামকৃষ্ণমিশনের মহান উদ্দেশ্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষায় সর্বপ্রথম সৃজনশীল প্রতিভা। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস-এর 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহিংস ও অহিংস সব সংগ্রামীকে শক্তি জোগাত। সহিংস বিপ্লবীরা 'বন্দেমাতরম্' বলে মৃত্যুবরণ করেছে। অহিংস সংগ্রামীরা-ও 'বন্দেমাতরম্' বলতে বলতে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছে। সাংবাদিকতায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' ও অন্যান্য বহু উপন্যাস যেমন তিনি লিখেছিলেন, তেমন 'কৃষ্ণচরিত্র' ধর্মক্ষেত্রে অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ভারতের নবজাগরণে নানাবিধ ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের অবদান রেখেছেন—সকলের কথা বলা সম্ভব নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মহম্মদ ইকবাল, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মণ্যভারতী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী ভাষায় লেখকদের মধ্যে তরু দত্ত, অরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহেরু, রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেমন ছিলেন বিখ্যাত নট, তেমন লিখেছিলেন অনেকগুলি নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং আরও কেউ কেউ নাটক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে ছিল—ঐতিহাসিক, সামাজিক, রূপক-নানাবিধ নাটক।

শিল্পকলায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, মুকুল দে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানজগতে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ('বোস আইনষ্টিন থিয়োরী'-র জন্য খ্যাত), মেঘনাদ সাহা, বীরবল সাহানী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

দার্শনিকদের মধ্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ সরকার, ভাণ্ডারকর, সরদেশাই, কে, এম মুন্সী, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

নবজাগরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক বড় লোকদের আমি দেখেছি। কিন্তু এ বিষয় আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে সবথেকে বড় যাঁদের দেখেছি তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন গান্ধী ও ঠাকুর। এ শতাব্দীর গত পঁচিশ বছরে তাঁরা হলেন, অতি বড় দুই ব্যক্তি। আমি নিশ্চিত যে কালক্রমে বড় সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষ, একনায়ক এবং উচ্চবাক রাজনীতিকগণ, যখন মৃত্যুর পর বিস্মৃত হবেন, তখন এ দুজনের মাহাত্ম্য স্বীকৃত থাক বে।

আমি অবাক হয়ে ভাবি একই যুগে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় (অথবা সেই কারণেই) এদেশে কি করে এমন দুই মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হলো। এই আবির্ভাবের ফলে ভারতের অজেয় জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।……

আর একটি দিকও আমাকে বিস্মিত করে। গান্ধীজি ও গুরুদেব বিশেষতঃ গুরুদেব, পাশ্চাত্য জগৎ ও অন্যান্য দেশ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এঁদের কেউই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নন। এঁদের বাণী সারা বিশ্বের জন্য, তবুও এঁরা পুরাপুরি ভারতসন্তান এবং যুগযুগধাবিত সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রচারক। এঁদের বিপুল জ্ঞান ও সংস্কৃতি সত্ত্বেও এঁরা মনেপ্রাণে ভারতীয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে উভয়ের নানাবিধ সাদৃশ্য সত্ত্বেও এবং একই ভারতীয়

জ্ঞানভাণ্ডার থেকে প্রেরণা লাভ করলেও, উভয়ের পার্থক্য এত বেশী, অন্য কোন দুজন ব্যক্তির এত পার্থক্য আছে কিনা সন্দেহ। আমি আবার ভাবি ভারতীয় সংস্কৃতির সেই আবহমান কালের সম্পদের কথা যা একই যুগে এরকম বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দুই মহান ব্যক্তিকে সৃষ্টি করতে পারে, যা পুরোপুরি ভারতীয় অথচ চরিত্রে ভারতের বিচিত্র ভাবধারার স্বতন্ত্র প্রকাশ।"

(কৃষ্ণ কৃপালনী-কে লেখা ইংরেজীর অনুবাদ)

দাদাভাই নৌরোজি, গোখেল, তিলক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রভৃতি আরও অনেক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভারতের নবজাগরণে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বঙ্গভঙ্গরদ ও স্বদেশী আন্দোলন

ভারতীয় নবজাগরণে প্রথম প্রভাবিত হয় বাঙালীরা। জাতীয় চেতনা বোধের উন্মেষ, ভারতের অতীত গৌরবে গৌরববোধ এবং ভবিষ্যৎ গৌরব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বাঙালীর মনে জেগে উঠল। এই জাতীয় চেতনায় সারা দেশকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ শুরু করলেন লেখক ও সাংবাদিকগণ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন,

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?"

পরবর্তী বৎসর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মুখবন্ধে লেখা হলো—

"শুনগো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যাজ, ঘুমঘোর
হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলা' শুরু হয়। প্রতি বছর 'গাও ভারতের জয়', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটি দিয়ে হিন্দু মেলার উদ্বোধন হোত।

"মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনোপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান,
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।"

'বন্দেমাতরম্'-এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা এইরূপ, "এই মহান

সঙ্গীতটি সারা ভারতে গাওয়া হোক, হিমালয়ে ইহা প্রতিধ্বনিত হোক, গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্মদা-গোদাবরী তীরস্থিত বৃক্ষে, বৃক্ষে; পূর্ব ও পশ্চিম সাগরের কলরোলের সঙ্গে এ গান মিশে যাক। সারা ভারতের বিশ কোটি লোকের হৃদয়ে এ গানের সুর বেজে উঠুক।"

এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলেন। এই মনোভাব আমরা সেকালে ক্রমে ক্রমে দেখতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', ঠাকুর পরিবারের 'সাধনা', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', হরিশচন্দ্র চ্যাটার্জির 'প্যাট্রিয়ট', অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায়। শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাংলা কাগজ ছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে "ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাকট' পাশ হওয়ায় সম্পাদক রাতারাতি একে ইংরাজীতে প্রকাশ করলেন এবং সেই থেকে আজও 'অমৃতবাজার' ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এই প্রবল জাতীয় মনোভাব দেখে সন্ত্রস্ত হলো এবং গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন বাংলাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা করলেন। তাঁর প্রকাশ্য যুক্তি ছিল যে একটা বড় প্রদেশকে দুটি ছোট প্রদেশে ভাগ করলে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়বে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক এবং শঠবুদ্ধি প্রণোদিত। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একটি গোপনীয় চিঠিতে তৎকালীন ভারত সচিবকে কার্জন লিখেছিলেন, "বাঙালীরা নিজেদেরকে একটা জাতি হিসাবে ভাবে এবং স্বপ্ন দেখে যে একদিন ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা কলকাতার রাজভবনে বসবে; কাজেই যে কোন সিদ্ধান্ত তাদের এই স্বপ্নে বিঘ্ন ঘটালে তারা অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবে; সে কারণেই এখনই বঙ্গবিভাগ করে তাদের দুর্বল না করতে পারলে এর পরে আর পারা যাবে না; তাতে ফল হবে ভারতের পূর্বপ্রান্তে এখনই যে দুর্ধর্ষ শক্তি গড়ে উঠেছে তা ভবিষ্যতে আরও বহু অসুবিধা সৃষ্টি করবে।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসচিব লর্ড মোরলে ঘোষণা করলেন যে বঙ্গবিভাগ একটি বাস্তব ঘটনা, এর আর নড়চড় নেই।

এই একই শঠবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর জন্য শাসকশক্তির প্রেরণায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিমলীগ স্থাপিত হলো; কারণ বঙ্গবিভাগরদের আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করেছিলেন।

বারাণসীতে একটি বক্তৃতায় তৎকালীন অন্যতম প্রখ্যাত দেশনেতা গোখেল

বলেছিলেন, "ভাইসরয় স্থির করেছেন, তাঁর কর্মচারীরা রায় দিয়েছেন। কাজেই জনসাধারণের মতামতের আর প্রশ্ন কি, আর তারা আন্দোলনই বা করবে কেন? দেশীয় লোককে এইভাবে উপেক্ষা ও অবমাননা শুধু নয়, মিথ্যা অভিযোগ করা হলো যে এটা কতিপয় লোকের চক্রান্ত, আসলে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষ। উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান সকলেই এবং আমাদের সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত, সারা প্রদেশে প্রসারিত এবং এত প্রবল আন্দোলন আর কখনও কোথাও হয়নি।"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশালে যে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ব্যরিষ্টার আবদুল রসুল এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি ছিলেন, সৈয়দ মোতাহার হোসেন, এবং সহ-সভাপতি বিখ্যাত জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। সারা বাংলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। জেলাগুলির নেতাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার।

পূর্ববঙ্গের তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর, ব্যামফিল্ড ফুলার, নির্দেশ জারি করলেন যে, কোন শোভাযাত্রা, সভা, সম্মেলন বা কোন প্রকাশ্য স্থানে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। 'সঞ্জীবনী'-র সম্পাদক, কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সভাপতি এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে সম্পাদক করে একটি নির্দেশনামা-বিরোধী সমিতি (Anti Circular Society) স্থাপিত হলো। বরিশাল সম্মেলনে এই নির্দেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, রাজবাহাদুরের হাভেলীতে প্রতিনিধিবর্গ এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে সমবেত হলেন এবং কাব্যবিশারদের 'যায় যাবে প্রাণ, গাও বন্দেমাতরম্' এই গানটি সমবেত ভাবে গেয়ে সবাই মিলে শোভাযাত্রা শুরু করলেন—প্রত্যেক সারিতে তিন জন করে এবং প্রত্যেকের মুখে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি।

পুলিশ লাঠি চালাল, ঘোড়সওয়ার পুলিশ শোভাযাত্রার মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে দিল। বরিশালের চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা লাঠির ঘায়ে 'বিবির মহলা' পুকুরে পড়ে

গেলেন—তখনও বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করতে থাকায় লাঠিচালনায় তাঁর মাথায় জোর আঘাত লাগে। ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও খুব আহত হন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করে জরিমানা করা হল। এই শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেয়ার পরও দশ হাজারের অধিক লোক সম্মেলনের সভামণ্ডপে সমবেত হন। এই সভায় মৌলভী আবদুল গফুর, ভূপেন বসু ও বিপিন পাল উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেন। ভূপেন বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ আজ এখানে উপ্ত হলো।'

এই প্রাদেশিক সম্মেলনেই নেতারা স্থির করলেন যে বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের আন্দোলন একসঙ্গে চালানো হবে। বিলাতী বস্ত্রাদির দোকানে পিকেটিং করা হবে, যাতে বিলাতী বস্ত্রাদি কেউ না কেনে। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের উদ্দেশ্যে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' স্থাপিত হলো। এই সমিতির গ্রামে গ্রামে দুশো শাখা হলো এবং বিলাতী কাপড় ও নুন বর্জনের আন্দোলন জোরকদমে চলতে লাগল। তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মোর্লে এই আন্দোলনকে সীমান্তযুদ্ধের মত গুরুত্বপূর্ণ বলে উক্তি করেছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন। এর ফলে সারা ভারতে আত্মশক্তিতে আস্থা জন্মাল এবং দেশী জিনিসের জন্য আকর্ষণ বাড়ল।

প্রত্যেক আন্দোলনেরই একটা সাংগঠনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তিনি দেশের মানুষদের দেশপ্রেম ও মনোবল সৃষ্টির জন্য অনেকগুলি কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলি এমন উদ্দীপনাময় ছিল যে, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'—এই ভাবে প্রণোদিত হয়ে প্রথম বাংলা-বিভাগের বহু বছর পরেও, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে, রফিক, সালম, জব্বার, বরকত-এই বাঙালী যুবকেরা পাকিস্তান পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়—বাংলা ভাষা ও বাঙালীর মর্যাদা রক্ষার জন্য। এবং তার ফলেই ১৯৭০-এ পূর্ব- পাকিস্তান-এর বাঙালীরা পাকিস্তানীদের হঠিয়ে দিয়ে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' গঠন করে। পাকিস্তান কবলমুক্ত স্বাধীন বাংলার মুক্তিযুদ্ধে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই শেখ মুজিবর রহমান-ও রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গানটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়েছে। গানটি এই—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে,
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।"

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করা, সাহস সঞ্চার করা, বিপদে ভরসা রাখা—এসব রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতগুলির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি কবিতা বা তার অংশ উদ্ধৃত করছি—

"ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।"

আর একটি—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয়মা' বলে ভাসা তরী,
ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা সবাই মিলে, বৈঠা নেরে, খুলে ফেল সব দড়াদড়ি॥
... ...
ঘাটে বাঁধা দিন গেলরে, মুখ দেখাবি কেমন করে—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি।"

আবার ভরসার কথা—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে,
যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে,
ওরে মন হবেই হবে।"

আবার নির্ভীকতার বাণী—

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই মরব না,
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে—
সহজ পথে চলব, ভেবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে—
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥"

এমনি ভাবে চারণ কবি মুকুন্দ দাস গেয়ে বেড়াতেন—

"ফুলার আর কি দেখাও ভয়,
হাত বেঁধেছ, পা বেঁধেছ, মনতো স্বাধীন রয়।"

ফুলার ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর। যাঁরা বঙ্গভঙ্গ-রদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মীতা ও আন্দোলন পরিচালনের দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবিদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা। ফলে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারকেও ১৯১১ সালে বাধ্য হয়ে রদ করতে হয়।

এই সার্থকতা সারা ভারতে আস্থা ও উৎসাহ সঞ্চার করল এবং ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত বলে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন সহিংস ও অহিংস এই দুটি ধারাতেই প্রবাহিত হয়েছিল। এর আদি পর্ব এবং পরবর্তী তিনটি পর্ব ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম চিন্তা করলেন যে ভারতে এমন একটি সংগঠন প্রয়োজন যেখানে দেশের বিভিন্ন মতের প্রতিফলন ঘটবে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি 'ভারত সম্মেলন' উদ্বোধন করেন, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামত প্রকাশ এবং দেশের কাজে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যে সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন হয় তাতে বিভিন্ন বিশিষ্ট নগরীর বহু প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের সভাপতি, আনন্দমোহন বসু, অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে এই সম্মেলনই জাতীয় পার্লামেন্ট গঠনের প্রথম পর্যায় হবে। ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন হয় কলকাতাতে।

এই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। লর্ড ডাফ্‌রিন-এর নির্দেশে, এ্যালান হিউম্‌-এর চেষ্টায় এবং বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের সহযোগিতায় কংগ্রেসের জন্ম। বম্বেতে প্রথম অধিবেশন হয় উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে, আর পরের বছর কলকাতায়, দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। কংগ্রেসের প্রথম পর্ব ছিল,—১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ অবধি। বৃটিশদের ন্যায়পরায়ণতায় আস্থা নিয়ে, এই সময় কংগ্রেসের দাবি ছিল কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, দেশের স্বাধীনতা নয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো নয়, তবে এই শাসনব্যবস্থাকে উদার ও মহৎ করে ভারতবাসীর আস্থা ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত করা। লোকমান্য তিলক 'স্বরাজ' কথাটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ব্যবহার করেন, কিন্তু তখনও তা তেমন জনপ্রিয় হয়নি এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির মধ্যে এর কোন উল্লেখ ছিল না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব—১৯০৫ থেকে ১৯১৯। ১৯০৩-এ সভাপতির ভাষণে লালমোহন ঘোষ দিল্লী দরবারের উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, 'একটি বিরাট সরকারের এমন হৃদয়হীন কাজ আর হয় না; পৃথিবীর সব থেকে দরিদ্র দেশের লোকদের কাছ থেকে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করে তা বেপরোয়া

ভাবে উৎসবের জৌলুসে খরচ করা, যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিচ্ছে—এর থেকে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে?'

বিলাত থেকে ফিরে লালা লাজপত রায় বললেন, দুর্দশাগ্রস্ত ভারতবাসীদের জন্য বৃটিশ সরকার বা বৃটিশ প্রেসের কোন উদ্বেগ নেই, কিছু করার আগ্রহও নেই। তিনি দেশবাসীকে বললেন, কোন প্রতিকার পেতে হলে ভারতবাসীকে ঐকান্তিক ভাবে স্বাধীনতার জন্য আঘাত হানতে হবে।

নূতন প্রগতিপন্থীদের নায়ক ছিলেন লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল। এঁদের তখন 'গরমপন্থী বা উগ্রপন্থী' বলা হোত, আর অন্যদের বলা হোত 'নরমপন্থী'। তিলক এর সূত্রপাত করলেন এই বলে যে 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার' এবং আমাদের তা পেতেই হবে। তাঁরা বিদেশী জিনিষের বয়কট বা বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি এবং শান্ত প্রতিরোধের উপর জোর দিলেন। লাজপতরায় বললেন, লাটভবনের দিকে তাকিয়ে না থেকে আমাদের দরিদ্রের কুটীরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তিলক অসহযোগ আন্দোলনের উপর জোর দিলেন। তিনি বললেন, একথা আমাদের বুঝতে হবে যে ভারতে বৃটিশ শাসন ভারতীয়দের সহযোগিতায়-ই চলছে এবং যদিও আমরা নির্যাতিত এবং অবহেলিত, তবুও আমরা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করলেই এই শাসনকে অচল করে দিতে পারি।

তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি কার্যকর হলো, বঙ্গভঙ্গ রদ হলো, এবং জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত সমাজ থেকে সর্বসাধারণের মনে প্রবেশ করল।

মিসেস এ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের মত এদেশেও হোমরুল বা স্বদেশ শাসনের আন্দোলন শুরু করলেন। তিলকও বম্বেতে 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করে এই আন্দোলন আরও জোরদার করলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে স্বশাসনের অধিকার দানের ঘোষণা করায়, এ আন্দোলন আর এগোল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে (১৯১৯—১৯৪৭) নেতৃত্বে এলেন মহাত্মা গান্ধী।

স্বরাজ লাভই এযুগের আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৯৩০-এর কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেয়া হলো। মহাত্মা গান্ধী এ যুগের সর্বাধিনায়ক; গোপন ষড়যন্ত্র ও সহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এবং সক্রিয় প্রতিরোধের কথা তিনি ঘোষণা করলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস অসহযোগিতার পথ তিনি

দেখালেন। যে সরকার শাসিতের কল্যাণে অনিচ্ছুক এবং স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী, সে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখালেন। স্বাধীনতা আন্দোলন এবার গণ-আন্দোলনে পরিণত হলো।

মহাত্মা গান্ধী প্রথমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। তখনকার দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে যা সত্য এবং যুক্তিযুক্ত তা মেনে নিতে হলো এবং ১৯১৫-তে ঐদেশে ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতি যে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো, তা দূর হলো।

গান্ধীজি ভারতে ফিরে এলে প্রথম রবীন্দ্রনাথের বড়দা, দ্বিজেন্দ্রনাথ, তাঁকে 'মহাত্মা' বলে সম্ভাষণ করেন, তারপরই রবীন্দ্রনাথ এবং পরে সারা দেশ গান্ধীজিকে 'মহাত্মা গান্ধী' বলতে লাগল।

যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার কথা গান্ধীজি চিন্তা করেছিলেন তার মূল হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীর মানবসমাজে তিনি এই অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যে সমাজে সত্য ও অহিংসা মূলমন্ত্র হবে এবং লোভ, অত্যাচার ও দুরাকাঙ্খা থাকবে না। তিনি আরও বললেন, পররাজ্য লুণ্ঠন, অধিকার ও অত্যাচারই বহু জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

তিনি বৃটিশ সরকারকে বুয়র যুদ্ধে, জুলু বিদ্রোহে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু রাউলাট একট্ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও হতাশ হলেন। বৃটিশ শাসনকে তিনি বললেন, 'শয়তানের শাসন' এবং ১৯২০-এ অসহযোগিতা ও আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯২১-এ প্রায় ৩০ হাজার লোক কারারুদ্ধ হল।

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও নির্দেশ অহিংস আন্দোলনের, কিন্তু তা সত্বেও উত্তরপ্রদেশের চৌরীচৌরাতে এক হিংসা কাণ্ড ঘটে, যার ফলে কয়েকজন পুলিশের মৃত্যু হয়। গান্ধীজি দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারীতে এই আন্দোলন তুলে নিলেন এবং গঠনমূলক কাজের নির্দেশ দিলেন।

এই আন্দোলন প্রত্যাহারে অখুশি হয়ে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করলেন। সিদ্ধান্ত হলো আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করে ভেতর থেকে শাসনযন্ত্রকে অচল করা। কিছুকাল বাদে তাঁরা আবার গান্ধীজীর সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্য।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন হলো লবণ-সত্যাগ্রহ। অত্যাচার সত্বেও সত্যাগ্রহীরা প্রবল সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন, বিশেষতঃ ধর্ষণায়। ১৯৪২-এ

গান্ধীজি বৃটিশকে ভারত ছাড়ার ডাক দিলেন (Quit India Movement)। ভারতসরকার নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন ও নিপীড়ন চালাতে লাগলেন এবং সর্বভারতীয় নেতাদের আটক করলেন। আন্দোলনকারীরা অধৈর্য হয়ে নানাবিধ নাশকতা মূলক কাজ করলেন। পুলিশের গুলিতে সহস্রাধিক আন্দোলনকারীর মৃত্যু হলো এবং বহুসহস্র আহত হলো। অন্যদিকে মোহাম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বেড়ে চলল এবং মুসলমানরা একটি পৃথক রাজ্য, 'পাকিস্তান'-এর দাবি তুললেন, মুসলমান নেতৃগণ তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। এ সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়। এর ফলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় বহু লোক প্রাণ হারাল ; এই দাঙ্গা ক্রমে ক্রমে নোয়াখালি, বিহার ও দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল। মহাত্মা গান্ধী কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে নোয়াখালি ছুটে গেলেন এবং হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ফিরিয়ে আনার জন্য নোয়াখালি, বিহার ও দিল্লীতে চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু বিরোধ মিটল না এবং মুসলমান নেতাগণ পৃথক রাজ্যের দাবিতে অটল রইলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মাউন্টব্যাটেন ওয়াভেলের জায়গায় ভাইসরয় হয়ে এলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে দেশবিভাগ ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান হবে না ; গান্ধীজির আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃবর্গ দেশবিভাগে রাজি হলেন, ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র হলো ; হিন্দু-প্রধান ভারত ও মুসলমান-প্রধান পাকিস্তান। অন্যান্য লোকেরা ১৫ই আগষ্ট নানা উৎসব ও উল্লাস করলেও ভারতবিভাগের জন্য মহাত্মা গান্ধী সেদিন দুঃখে উপবাস-ব্রত পালন করলেন। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করাকে একটি জীবন্ত মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করার মত নিষ্ঠুর ও দুঃখজনক কাজ বলে গান্ধীজি মনে করতেন এবং বলতেন। দেশবিভক্ত হওয়ার পরও তিনি ভারত ও পাকিস্তানের সকল সম্প্রদায়ের মিলন ও মৈত্রীর জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করে গেছেন। ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী একটি প্রার্থনা সভায় যোগদানের ঠিক পূর্বে এক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা-বাদীর গুলিতে গান্ধীজি নিহত হন।

গান্ধীজি শুধু ভারতবর্ষের—ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেননি। সারা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের চরিত্রের মান উন্নত করেছিলেন। সত্যই তিনি জাতির পিতা হিসাবে গণ্য হতে পারেন এবং ভারত তাঁকে জাতির জনকরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কতগুলি গুরুতর ভুল তাঁর আমলেই কংগ্রেস করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের সময়

হিন্দু ও মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা পরস্পর হানাহানিতে প্রবৃত্ত হল কেন? যদিও সুযোগসন্ধানী কয়েক ব্যক্তি মুসলমানদের নেতৃত্বে এসেছিলেন এবং দেশের সার্বিক স্বার্থ থেকে তাঁদের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থবোধ এই দুই জাতিতত্ত্বের দিকে টেনে নিয়েছিল, তবুও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অনেককে কংগ্রেস ঠেলে দিল সাম্প্রদায়িক মুসলিমলীগের দিকে, কংগ্রেসের ভুল কাজের জন্য। ১৯৩৭-এ বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে অরাজি হওয়ায় অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাই মুসলিম লীগের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কিছুতেই ছাড়লেন না।

শুধু মহাত্মা গান্ধীর চালিত কংগ্রেসের নয়, তাঁর নিজের আচরণেও এমন কিছু ছিল যাতে মুসলমানরা হিন্দুরাজের আশংকায় শংকিত হয়েছিল। তাঁর রামরাজ্যের স্বপ্ন ও তদনুযায়ী বাক্য ও আচরণ মুসলমানদের মনে শংকা জাগিয়েছিল। অনেক হিন্দু নেতার বাক্য ও আচরণও মুসলমানদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সৃষ্টির চক্রান্ত ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ স্থাপন থেকেই অব্যাহত ভাবে চলে আসছিল।

এই দেশবিভাগের ফলে কয়েককোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সহস্র-সহস্র লোক প্রাণ হারিয়েছে। সীমান্ত নেতা গান্ধীপন্থী আবদুল গফুর খান-এর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলমান-প্রধান হলেও কংগ্রেসপন্থী ছিল। তাঁর প্রদেশও পাকিস্তানে পড়ায় তিনি ক্ষোভ করে বলেছিলেন যে 'কংগ্রেস তাঁদেরকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথের মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীই। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস। এর মধ্যে পুঁথির কোন নজির নেই। এর জন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে? আত্মার মধ্যে যে শক্তিভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শ মাত্র। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারে যে মুহূর্তে এসে

দাঁড়ালো অমনি তা খুলে গেল।"

ভারত-আত্মার মূর্তরূপ যেন ধারণ করে এসেছিলেন গান্ধীজি। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়, ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন, লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপনার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি।"

রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র চরিত্র। এই চরিত্র আমরা প্রথম দেখি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'প্রায়শ্চিত্ত' উপন্যাসে, পরে ১৯২২-এ 'মুক্তধারা' নাটকে এবং আবার ১৯২৯-এ 'পরিত্রাণ' নাটকে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনা আছে রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেননি, কারণ তিনি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে হিংসার বিরোধী ছিলেন।

'শাসনে যতই ঘেরো; আছে বল দুর্বলেরও,'

... ...

'একত্র দাঁড়াও দেখি সবে, যখনি জাগিবে তুমি
তখনই সে পালাইবে ধেয়ে।'

—এসব ধনঞ্জয়ের মুখে বা রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি; তিনি মনে করতেন যে অত্যাচারীর শক্তি অত্যাচারিতের আত্মবিশ্বাসের অভাবের উপর দাঁড়িয়েথাকে; যদি সে ভয় দূর করা যায়, শক্তিমান নিজের খুশিমত চলতে পারে না। অত্যাচারী বিক্রমাদিত্যের মুখোমুখী হন ধনঞ্জয় প্রেমের বলে, আত্মার বলে। ধনঞ্জয়ের ধনের লোভ নেই, ক্ষমতার লোভ নেই, দুঃখ ও মৃত্যু ভয়ও তিনি জয় করেছেন। বিপদের আশংকাকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেন, এমনকি ধ্বংসের আগুনকেও, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী; তাঁর কোন লোভ নেই। পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁকে পরাহত করতে পারে না। আত্মবিশ্বাস ও সার্বিক প্রেমের মাধ্যমে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ধনঞ্জয় চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। কয়েকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

(ক) "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান,
তুমি কি এমনই শক্তিমান!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান?

হওনা যতই বড়, আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচবিনেরে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।"

খ) "ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই, তোমার শিকল ভাঙা
এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।"

গ) "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।"—নৈবেদ্য ১৯০১

ঘ) "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দউজ্জল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে কবি
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
(এবার ফিরাও মোরে—১৮৯৪)

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ এবং নেতার বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি অহিংস সমাজ যেখানে সদস্যরা হবে নির্ভীক, সবলচিত্ত, আত্মপ্রত্যয়শীল ও স্বতন্ত্র। তাদের নেতা হবেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত, যাঁর আত্মশক্তি প্রবল, মুখে কোমলতা, অন্তরে দৃঢ়তা এবং উদ্দেশ্যসাধনে অটল মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "দীনহীন বেশী, ভূষণহীন, নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তি...তাহা বলিষ্ঠ, ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী, তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি জ্বলিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা গান্ধীজির মধ্যে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। গান্ধী-পন্থী মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে এক মহান পুরুষ ছিলেন সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খান। গান্ধীজির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় নিজস্ব ভিন্ন মত পোষণ করতেন। যেমন চরকা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বিশ্বসহযোগিতা, সমবায়, গ্রামপুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির মতনিরপেক্ষ নিজস্ব মত পোষণ করতেন এবং নিজস্ব কর্মপদ্ধতি রচনা করতেন।

সুরেন্দ্রনাথ, গোখেল, তিলক প্রভৃতি যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তা মূলতঃ অহিংস, গান্ধীজির আন্দোলন গণ-আন্দোলন হলেও অহিংসাই ছিল মূল মন্ত্র।

এই অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ শতকের গোড়া থেকে চলছিল সহিংস ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বিদেশী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য এই সহিংস আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন), মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), সূর্য সেন প্রভৃতি। সর্বোপরি এবং সর্বশেষ নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বীর সাভারকর, ভগৎসিং, যতীন দাস প্রমুখ আরও উল্লেখযোগ্য নাম আছে।

এরকম সহস্র সহস্র কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়, এবং শত শত লোককে গুলি করে হত্যা, ফাঁসি দেয়া বা আজীবন কারাবাস বা নির্বাসনে রাখা হয়। যাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে ক্ষুদিরামই বোধহয় সর্বকনিষ্ঠ ; ভগৎ সিং, রাজগুরু প্রভৃতি-কে যেমন ফাঁসি দেয়া হয়, তেমন অনেকে আটকের অপমান এড়াবার জন্য পোটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে প্রাণ দেন। যতীন দাসতো দীর্ঘকাল অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় রাজস্থানের দেওলী ও মেদিনীপুরের হিজলীতে পুলিশ গুলি চালায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলে, এই কথা দিয়ে শেষ করেছিলেন তাঁর বক্তৃতা, "পরিশেষে আমি বিশেষভাবে গভর্ণমেণ্ট-কে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল নৃত্য এখনই শান্ত হউক।"

এবার সহিংস আন্দোলনের কথা কিছু বলছি। অরবিন্দ ঘোষ শৈশব থেকে ইংল্যাণ্ডে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষিত হন ; তিনি প্রাচীন ও আধুনিক অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় ভাষাও শিখেছিলেন। বোমা তৈরীর অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালীন উদীয়মান ব্যারিষ্টার এবং পরে বিশিষ্ট জাতীয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, এমন সুন্দর সওয়াল করলেন যে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, শুধু তাই নয়, চিত্তরঞ্জনও বিশেষ খ্যাতি লাভ করলেন। কারাগারে অবস্থানকালে অরবিন্দ এক ঐশ্বরিক প্রেরণা পেলেন। মুক্তি পেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করে তিনি তৎকালীন ফরাসী উপনিবেশ, চন্দননগর-এ চলে গেলেন এবং যোগাশ্রম স্থাপন করে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে তিনি ঋষি শ্রীঅরবিন্দ নামে খ্যাত হলেন। প্রথম জীবনে দেশকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য তিনি 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকায় সম্পাদনা করতেন। ধর্মজীবনে তিনি ইংরেজীতে গদ্যে ও পদ্যে বহু পুস্তক রচনা করেছিলেন। ইংরেজী গদ্যে

'লাইফ ডিভাইন' এবং পরে 'সাবিত্রী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অরবিন্দের ভাই, বারীন ঘোষ, শুধু বোমা তৈরী নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ও বাঘা যতীন জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাঘাযতীন বালেশ্বরে লড়াই করে মারা যান। স্বাধীনতার কিছু হলো না কিন্তু বারীন ঘোষ আজীবন বিপ্লবী ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্ভবতঃ প্রথম বাঙালী যিনি লেনিন ও ১৯১৭-র রুশ-বিদ্রোহের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ছিলেন এবং ভারতে 'র‍্যাডিকাল পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন।

সূর্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা ছিলেন এবং চট্টগ্রাম শহর কিছুদিন দখলে রেখেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু, আই. সি. এস পদ ছেড়ে দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি সহিংস ও অহিংস যে কোন আন্দোলনের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভে বিশ্বাসী ছিলেন। গান্ধীজি সহিংস আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়ই ভাল হতে হবে এবং হিংসা ভাল নয়। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির অনুমোদনে ১৯৩৮-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ এ আবার গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী, ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া-কে ভোটে পরাজিত করে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যে বৃটিশ সরকারকে চরমকথা জানানো হোক যে আগামী ছ-মাসের মধ্যে স্বাধীনতা দিতে হবে, নতুবা প্রবল জাতীয় আন্দোলন শুরু হবে। গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতাদের বিরোধিতায় এ প্রস্তাব গৃহীত হলো না। উভয় পক্ষের বিরোধ কিছুতেই না মেটায় ১৯৩৯-এর মে মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি দল গঠন করলেন। 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ বিভিন্ন প্রদেশের বহু কংগ্রেস কর্মী যোগ দিলেন এবং এই দল শক্তিশালী হয়ে উঠল। তিনি 'ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডির' স্মারক, হলওয়েল মনুমেন্ট, মিথ্যার প্রতীক বলে, আন্দোলন করে ভেঙ্গে দিলেন।

১৯৪০-এর জুলাই-এ সুভাষ ও তাঁর অনেক সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হলো, কারারুদ্ধ থেকে দেশের কাজ করতে না পারার প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশন শুরু করলেন, যখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল তখন বাঙলা সরকার তাঁকে এক প্রাতে তাঁর স্বগৃহে নিয়ে গৃহবন্দী করে রাখল।

তারপর একটানা চল্লিশ দিন তিনি শোবার ঘর থেকেও বেরোননি এবং ওতদিন দাড়ি না কেটে বেশ একটা বড় দাড়ি হলো। ১৯৪১-এর জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে একদিন প্রত্যুষে জিয়াযুদ্দিন নামে এক মুসলমানের ছদ্মনামে তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং পেশোয়ার হয়ে কাবুলে পৌঁছে গেলেন। কাবুল থেকে ইতালীয়ান দূতাবাসের সহযোগিতায় তিনি মস্কো হয়ে বার্লিন পৌঁছে গেলেন।

তিনি হিটলারের সমর্থন পেলেন; বার্লিন থেকে 'স্বাধীন ভারত রেডিও'-তে তিনি বক্তৃতা করলেন এবং ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে যেসব ভারতীয় সৈন্য জার্মানীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' তৈরী করলেন। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রের দলে যোগ দিলেন এবং তাঁদের প্রিয় নেতাকে 'নেতাজী' বলে সম্ভাষণ করলেন। ইতিমধ্যে জাপান প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে বহু বৃটিশ রাজ্য জয় করায়, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাসবিহারী বসু, যিনি জাপানে ত্রিশ বছর ধরে অবস্থান করছিলেন, তিনি পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী সকল ভারতীয়দের একটা সম্মেলন আহ্বান করলেন, সেই সম্মেলনে স্থির হলো সুভাষ বসুকে জাপানে এসে নেতৃত্ব নেবার আমন্ত্রণ করা। সুভাষচন্দ্র এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং একটি জার্মাণ সাবমেরিনে নব্বই দিনের বিপজ্জনক ভ্রমণ শেষ করে জাপানে পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে এলেন সিঙ্গাপুরে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে সকল ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিলেন তাঁদেরও অন্যান্য জাতীয়তাবাদের নিয়ে 'আজাদহিন্দ্ ফৌজ' গঠন করলেন। ১৯৪৩-এর ২১-শে অক্টোবর নবগঠিত আজাদহিন্দ্ সরকার গঠিত হলো এবং পরের রাত্রেই এই সরকার বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

কয়েকদিনের মধ্যেই জাপান, জার্মানী, ইতালী, ক্রোশিয়া, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপাইন ও মাঞ্চুরিয়া—এই নটি রাষ্ট্র আজাদহিন্দ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন।

এই সরকারের প্রচার বাণী ছিল, 'দিল্লী চলো'। ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী ইম্ফল আক্রমণ করে—বার্মা থেকে বহু বনজঙ্গল ভেদ করে, পাহাড় অতিক্রম করে—কিন্তু এই বাহিনীর কোন আকাশযান না থাকায় বৃটিশের বোমা এরোপ্লেনের আক্রমণে ইম্ফল অধিকার করা সম্ভব হলো না। ১৯৪৫-এর মে মাসে সম্মিলিত বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মিত্রবাহিনীর কাছে জাপান আত্মসমর্পণ করে। ঐ বছরের আগষ্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও

নাগাসাকি শহরের আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করায় বহু জীবনের হানি হয় এবং সহস্র সহস্র লোক পঙ্গু হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাপান-ও সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের পরই নেতাজী একটি বোমারু বিমানে সাইগন হয়ে জাপানে রওনা হলেন ১৯৪৫-এর ১৭ই আগষ্ট ; টোকিও রেডিওতে ঘোষণা করা হলো যে নেতাজী যাত্রাপথে ফরমোসায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

এর পর আজাদহিন্দ্ বাহিনী বৃটিশ বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। এই বাহিনীর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ—মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান, কর্ণেল পি. কে. সেহগল, কর্ণেল জি. এস. ধীলন প্রভৃতিকে দিল্লীর লালকেল্লায় যখন বিচারের ব্যবস্থা হয়, তখন্ সারা ভারতে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হয়। নৌবাহিনীর বম্বেস্থিত সৈন্যরাও বিদ্রোহ করে।

এইসব কারণে এবং মহাত্মা গান্ধীর ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ফলে, বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা বিদায় নেবেন—ভারতবাসীকে ভারতশাসনের অধিকার দিয়ে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট এই স্বাধীনতা এলো কিন্তু ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো—ভারত ও পাকিস্তান এই দুই সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বীকৃত হল।

পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের নেতাজী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার খানিকটা বাংলায় লিপিবদ্ধ করছি—"দূরে, বহুদূরে ঐ নদী, ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া আমাদের দেশ। ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। সারা ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে, আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়রা আত্মীয়দের ডাকিতেছে,-ওঠো, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই। অস্ত্র হাতে লও, দেখ তোমার সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথপ্রদর্শকগণ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রুসেনার পথ দিয়া আমরা পথ করিয়া লইব। ভগবান চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। যে পথ দিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ, স্বাধীনতার পথ, চলো দিল্লী।"

রবীন্দ্রনাথ হিংসা পছন্দ করতেন না, কিন্তু যখন মৃত্যুপণ করেও অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কাউকে বীরের মত রুখে দাঁড়াতে দেখতেন, তখন তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর 'নমস্কার' কবিতায় অরবিন্দকে তিনি লিখেছেন,

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন— ।"

আরও অনেকগুলি চমৎকার স্তবকের পর, তিনি তাঁর নমস্কার সমাপ্ত করেন, এই বলে—

"সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার !
"কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার !
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির।
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রকেও তিনি নেতৃত্বে বরণ করে নিলেন দেশনায়করূপে—

"সুভাষচন্দ্র,

বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কপদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্নীতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তরবেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।

সুভাষচন্দ্র তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভ ক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি। কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে ;

কিন্তু তোমাকে অভিভূত করেনি ; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ। বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মাননি। তোমার এই চরিত্র-শক্তিকে বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।"

সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আর এক বীর ছিলেন, কাজি নজরুল ইসলাম। এককালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্টে হাবিলদার, পরে তিনি কবি ও সাংবাদিক। তাঁর সংগ্রাম ছিল শুধু স্বাধীনতার নয়, সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, অবিচার, অত্যাচার, শোষণ—সব কিছুর বিরুদ্ধে। তিনি যখন সৈনিক এবং করাচীতে ছিলেন, তখন ১৯১৮-র রুশ বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি তিনি কিছু কিছু জানতে পেরেছিলেন এবং এর প্রভাব তাঁর জীবনে পড়েছিল। সৈনিক থাকতেই তিনি কিছু লিখেছিলেন যা কারো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। করাচী থেকে কলকাতায় এসে তিনি সাহিত্যে মনোনিবেশ করলেন এবং পরে সাংবাদিকতায়। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা ও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'নজরুলের যশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ করে বাঙালী যুবকদের চিত্তে কবিতাটি শিহরণ জাগিয়ে তুলল। ১৯২০-এর ২০শে জুলাই, তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট নেতা, এ. কে. ফজলুল হক, 'নবযুগ' নামে একটি সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশ করলেন। বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট কর্মী মুজফ্‌ফর আমেদ-এর সঙ্গে নজরুল এই পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হলেন। নজরুলের লেখার জন্য 'নবযুগ' শীঘ্রই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই কাগজে শুধু বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধেই লেখা হোত না, কৃষক ও মজুরদের ন্যায্য দাবী-দাওয়াও বিশেষভাবে প্রকাশ করা হোত। এর কতগুলি লেখা 'যুগবাণী' নামে একখানা বইয়ে প্রকাশিত হলো, সরকার বিদ্রোহের গন্ধ পেয়ে এই বইয়ের বিক্রয় ও পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করে দিল।

১৯২২-এ আগষ্টের ১১ তারিখে নজরুল 'ধূমকেতু' নামে একটি দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাগজের আবির্ভাবকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন—

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু।

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লিখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।”

১৯২২-এর ২২শে সেপ্টেম্বর, নজরুল ‘ধূমকেতু’-তে ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি লেখেন—

“আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁডাল,
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা—আসবি কখন সর্বনাশী ?”

এরূপ কবিতা লেখার জন্য নজরুলকে রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হলো। বিচারের সময় রাজবন্দীর জবানবন্দীতে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার উপর অভিযোগ আমি রাজবিদ্রোহী, তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী ও রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে রাজার মুকুট ; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা ; একজন রাজা হাতে রাজদণ্ড, আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড ; রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান।

“আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে ?”

কিছুদিন পরে নজরুলকে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হলো, সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের কুশাসন ও অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নজরুল এবং সঙ্গী রাজনৈতিক বন্দীগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে টেলিগ্রাম পাঠালেন—“**Give up hunger strike, our literature claims you**”—‘অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য তোমার উপর দাবি রাখে।’ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।

১৯২৩-এর ১৫ই ডিসেম্বর নজরুল মুক্তি পেলেন। রবীন্দ্রনাথ সকল প্রকারের সংগ্রামীদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর বহু কবিতায়। ‘সুপ্রভাতের

রাগিণী", কবিতাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।
হে রুদ্র তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী।
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাবো।
ভীষণ দুঃখে, ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাবো।"

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম কাজ। পাঞ্জাবে অমৃতসরে, একটি চারদিকে ঘেরা পার্কে সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে এক শান্ত সমাবেশের উপর জেনারেল ডায়ার সৈন্যদের দিয়ে ১,৬০০ রাউণ্ড গুলি চালালেন। সমবেত লোকদের বেরোবার সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কাজেই হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক। সরকারী হিসাবেও ৩৭৯ জন নিহত ১২০০' জন আহত হয়েছিলেন ; আহতদের কোন শুশ্রূষা বা চিকিৎসারও ব্যবস্থা হলো না। পাঞ্জাবে সামরিক আইন ঘোষিত হলো। এই ভয়ের রাজত্বকালে আরও কত গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, কত ফাঁসি দেয়া হলো, আকাশ থেকে বোমা ফেলা হলো, কত লোককে ট্রাইবুনালগুলি অত্যন্ত কঠোর শাস্তির হুকুম দিল, পরবর্তী অনুসন্ধানে তা প্রকাশ পেয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন বাদে এ সংবাদ পান। তিনি কলকাতায় এসে একটি প্রতিবাদ সভার প্রস্তাব করলেন ; কিন্তু ভয়ে অনেকেই রাজি হলেন না। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর নিজস্ব নীতি অনুযায়ী—'ওরে অভাগা, তোর কথা যদি কেউ না শোনে, তবে একলা চল, একলা চল রে',—১৯১৯ এর ২৯শে মে-র রাত্রে তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডকে তিনি এক পত্র লিখে তাঁকে যে 'স্যার' উপাধি বৃটিশ সরকার দিয়েছিল তা পরিত্যাগ করলেন। ২রা জুন সকালে এই চিঠি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়।

ইংরাজীতে লেখা চিঠিটি এইরূপ,

"The very least I can do for my country, is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dark anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand shorn of all special distinction, by the side of those of my countrymen, who for their so-called insignificance are liable to suffer a degradation, not fit for human blessings."

ইংরাজীতে তাঁর জীবনী লেখক, কৃষ্ণ কৃপালনী-র মতে, এই 'স্যার' উপাধি (knighthood) ত্যাগ দেশ-বিদেশে তাঁর মর্যাদা খুব বৃদ্ধি করল এমন নয়, বরং বৃটিশ সরকার এই কাজকে অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য বলে মনে করল ; কিন্তু দেশবাসী যখন ভয় ও বেদনায় স্তব্ধ তখন এই প্রতিবাদ দেশকে সাহস যোগাল, আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনল,-এটাই এই কাজের ঐতিহাসিক মূল্য। বৃটিশ সরকার এই আচরণ কখনও ভোলেনি।

'হিন্দু-মুসলিম সমস্যা' যার ফলে ভারত স্বাধীনতার সময় দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হলো, সে সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ডঃ কালিদাস নাগকে ১৯২২-এ এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "অন্য আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে মনে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ, এরা কি করে মিলবে ?

সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায় ? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে, য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে, মুসলমানকে, তেমনি গণ্ডীর বাইরে যাত্রা করতে হবে।

শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই যুগের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—তারপর আমাদের কল্যাণ হতে পারবে।···আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনরকমের স্বাধীনতাই পাব না।···

অন্তদেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব—যদি না আসি তবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ।"

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দের সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "ভারতবর্ষের অধিবাসীর দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা হবে, তা হলে বড়ই ভুল করব।"

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁর শেষ কথা আমরা শুনতে পাই, তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে—

"বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানতঃ দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এক পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে চিরকালের মত নির্জীব করে রেখেছে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির—আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকলদিকে শক্তিমান করে তোলার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর।···সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি পারস্য দেশ, একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল, তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে।

দেখে এলেম জরথুস্ত্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল, বর্তমান সভ্য শাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে।"

ভারতে বৃটিশ শাসনের-মূল্যায়ণ

ব্যক্তিগতভাবে বহু ইংরেজদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল—রথেনষ্টেন, ইয়েটস্ না হলে তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়াও সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। এণ্ডরুজ, এলমহার্ষ্ট তো তাঁর বহুকালের সহকর্মী ছিলেন। প্রথম জীবনে ইংরেজ জাতির উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা-ও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত শাসনের কুটিলতা, অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। ১৯৪১-এর ১৪ই এপ্রিল তাঁর অশীতিতম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধটিতে তিনি বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁর মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন, 'বৃহৎ-মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ-

জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হলো একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়।...তখন ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্ক-এর ও মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গে; নিত্যই আলোচনা চলত শেক্সপীয়রের নাটক নিয়ে, বায়রণের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্‌সে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস; সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয় ছিল ইংলণ্ডে, যাঁরা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিলেন, তাঁদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলুম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাঁদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।"

তিনি উপসংহারে বলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে, কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে, এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর

হবে, তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে মানুষের অর্থহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

একথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীর-ও ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি”

‘দুষ্কৃতকারী প্রথমে উন্নতি করতে পারে, কিন্তু তার সমূল বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।’ এই উপলক্ষে তিনি একটি কবিতাও রচনা করে পাঠ করেছিলেন—

“ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে॥
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে ‘মাভৈঃ মাভৈঃ’।
নবজীবনের আশ্বাসে।
“জয় জয় জয় রে ‘মানব-অভ্যুদয়’
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥”

ইতিহাসের ধারায় প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশশক্তিকে-ও একদিন ভারত ছেড়ে যেতে হবে, একথা তিনি ইতিপূর্বেই ‘ওরা কাজ করে’ এই কবিতায় লিখেছিলেন—

“কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল ;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।

শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।

... ...

আবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়াজাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"

১৯৪১-এর ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করলেন। ১৯৪২-এ গান্ধীজি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিলেন, কিছু পরে 'আজাদহিন্দ্ বাহিনী' গঠিত হলো, ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অবসানে 'United Nations Organisation' (সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘ) স্থাপিত হলো বিশ্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হলো। সবমিলে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্খিত নূতন যুগের সূচনা—মানব-অভ্যুদয়।

ভারত ও বিশ্ব

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্থান ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা চলে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আমি ভারতকে ভালবাসি শুধু একটি ভৌগোলিক সত্তারূপে নয়, অথবা এদেশে ভাগ্যক্রমে আমি জন্মেছি বলে নয়, কিন্তু ভারতের মহান সন্তানগণের জন্য, যাঁদের জ্ঞানের উজ্জ্বল চেতনাসম্ভূত বাণী যুগযুগের ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে আজও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। ব্রহ্মেই শান্তি, ব্রহ্মেই মঙ্গল, সর্বজীবে ব্রহ্মের অবস্থান। তাই আমাদের মাতৃভূমির বাণী এই যে শান্তি কোনো নেতিবাচক বস্তু নয়, কোনোরকম মিলেমিশে থাকা নয়, যা পরম মঙ্গলময় তাতে মহামিলন, যিনি এক, যিনি সমস্ত বর্ণবৈষম্যের ঊর্ধ্বে, যিনি সকল মানুষের অভাব মেটান, যাঁর মধ্যে আদি-অন্তকাল সবকিছুর অবস্থান, তিনিই আমাদের সকলকে সত্য ও মঙ্গলের আলোকে সম্মিলিত করুন।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আমাদের পূর্বপুরুষগণ একটি নির্মল, শুভ্র, পবিত্র আসন পেতে সেখানে বিশ্ববাসী সকলকে প্রেম ও মৈত্রী নিয়ে আগমনের সাদর আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রাচীন ভারতে এই চিরন্তন সত্যকেই ঘোষণা করা হয়েছিল, 'সেই শুধু দৃষ্টিমান যে সকলকে এক করে দেখে'।"

সেখানেই কবি আবার বলেছেন, "আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে কোন বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতির ধারণা এ যুগে অচল, ইহা বর্বর যুগের ধারণা; যে বিশেষ ধারণা বা সংস্কৃতি বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তা, সত্য হতে পারে না"; তিনি আরও বলেন, "এ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পৃথিবীর নানা জাতির মানুষ অনেক কাছাকাছি এসেছে; এখন সমস্যা এই যে এরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, না মিলনের ক্ষেত্র খুঁজে বার করবে। সীমাহীন প্রতিকূলতা না সহযোগিতা?"

তিনি ভারতের মহত্ব ও বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে যেমন সজাগ ছিলেন, তেমনি তিনি তাঁর সমকালীন ভারতের দুর্বলতা ও দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিশেষ দানও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। তিনি জানতেন সমগ্র মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে য়ুরোপের দানও অনেক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপ্রেরণা এবং প্রকৃতির গোপন তথ্য আয়ত্ত করার য়ুরোপীয় সাধনা

সমগ্র মানবসভ্যতার এক অমূল্য দান বলে তিনি মনে করতেন। যখন কবির বয়স বত্রিশ তখন ভারতের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং জাতি ও সম্প্রদায়গত বিরোধ, কবিকে বিচলিত করেছিল। তখন 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি তিনি লেখেন। কিছু অংশ তুলে ধরছি—

"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়! স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে! ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী,

... ...

কবি, তবে উঠে এসো-যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই কর আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

দরিদ্র ও নিপীড়িতদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি বহু সংগঠনমূলক কাজে হাত দিয়ে কৃষি-উন্নয়ন, শিল্প-শিক্ষা, সমবায় সংগঠন প্রভৃতি

নানাবিধ উপায়ে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের শুধু জীবিকা নয়, মিলেমিশে স্বাধীনভাবে কাজ করার অভ্যাস করে স্বনির্ভর হওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। আজ থেকে আশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কৃষি-শিক্ষার ডিগ্রীর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি চালু করার জন্য, বাংলাদেশে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই প্রথম একটি ট্রাক্টর কেনেন। সেকালে দেশের বেশীর ভাগ লোকই কৃষিনির্ভর থাকায়, কৃষি উন্নয়ন অর্থ জীবিকারই উন্নয়ন ছিল। যেহেতু কৃষিই শিল্পের প্রসূতি, কাজেই কৃষির উন্নতি শিল্পের উন্নতিরও সহায়ক হয়।

শুধু লেখায় নয়, গ্রাম পুনরুজ্জীবনের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন বীরভূমের সুরুলে 'শ্রীনিকেতন' স্থাপন করে। একাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন এল. কে. এমহার্ষ্ট। তিনি পাবনার পতিসরে তাঁদের হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের কল্যাণে এবং সমবায় কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে 'পতিসর সমবায় ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন। নোবেল পুরস্কারে তিনি যে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন তাও তিনি ব্যাঙ্কে রাখেন সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্য।

অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের একটি বড় অভিশাপ এবং সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পরিপন্থী। তাই তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে, তাদের সবার সমান।"

তিনি 'কালান্তর'-এ লিখেছেন—

"আমাদের ভদ্র সমাজ আরামে আছে, কেননা, আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্য জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব গালি দিতেছে, গুরুঠাকুর মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে, যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই।"

তাই তিনি জনশিক্ষার জন্য বিশ্বভারতী থেকে একটা ব্যবস্থা করেছিলেন যার সুযোগ ছোট বড় সকলেই নিতে পারত। অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজও দেশের প্রায় সত্তর ভাগ লোক নিরক্ষর।

ধর্ম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের ধারণা অত্যন্ত উদার ছিল। তাঁর মতে ঈশ্বরের অবস্থান মন্দিরে, মসজিদে বা গীর্জায় নয়, মানুষের অন্তরে তাঁর স্থান, তাই তাঁর কবিতা—

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে ।
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে ॥
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বারোমাস,
রাখোরে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে ।"

ভারতবর্ষ যেমন দরিদ্র তেমন অত্যন্ত জনবহুল । ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞ, মারগারেট স্যাঙ্গার এদেশে এসেছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণে জনমত গঠনের জন্য । তিনি বিশেষভাবে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের মত জানতে চাইলেন । গান্ধীজি আত্মসংযমের কথা বললেন এবং যান্ত্রিক জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করলেন । রবীন্দ্রনাথের মত অনেকটা বাস্তব ও আধুনিক । তিনি বললেন, ভারতের মত অনাহারক্লিষ্ট দেশে নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি একটা নিষ্ঠুর অপরাধ স্বরূপ—কারণ একাজ সমগ্র পরিবারকে দারিদ্র্য ও অনশনের মধ্যে ঠেলে দেয় । মানুষের নৈতিকবুদ্ধি যতদিনে আত্মসংযমে অভ্যস্ত করবে ততদিনে অসংখ্য শিশু জন্মাবে এবং দুঃখে-কষ্টে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে । এ শিশুদের তো কোন অপরাধ নেই, কাজেই এই প্রবল সামাজিক অবিচার অসহনীয় ।"

হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ পাপ মনে করতেন ; তাই নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধে জনচিত্তকে জাগরিত করার চেষ্টা বরাবর করেছেন । ভারতের রাজনীতিতে যখন বৃটিশ সরকার শুধু হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ নয়, হিন্দুসমাজকেও বর্ণ হিন্দু ও নির্যাতিত শ্রেণীতে বিভক্ত করতে চাইল, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ড, তখন গান্ধীজি কারাগারে আবদ্ধ । গান্ধীজি জেলে থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরণ উপবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন ; ১৯৩২-এর ২০শে সেপ্টেম্বর সারা দেশ এ সংবাদে স্তম্ভিত হলো । যে দিন গান্ধীজি উপবাস শুরু করবেন সেদিন সকাল (শেষরাত্র) তিনটায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন—

প্রিয় গুরুদেব,

এখন মঙ্গলবারের সকাল ৩টা । আজ দুপুরে আমি অগ্নি-দুয়ারে প্রবেশ করব । একাজে আপনি যদি আশিস জানাতে পারেন, আমি তা চাই । আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু, কারণ বন্ধুভাবে সরলতার সঙ্গে আপনি কি মনে করেন, স্পষ্টভাবে বলে থাকেন । আমি এবিষয়ে আমার কাজের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে

আপনার দৃঢ় মতের অপেক্ষায় ছিলাম। আপনি এখনও কোন সমালোচনা করেননি। যদিও আপনার মত জানার পূর্বেই আমার উপবাস শুরু হয়ে যাবে, তবুও আমার একাজ অন্যায় মনে করলে, আপনার সমালোচনা আমি মূল্যবান মনে করব; আমার ভুল হলে সে ভুল স্বীকার করতে অহংকার আমায় বাধা দেয় না, সে ভুল স্বীকার করে যতই অসুবিধা হোক না কেন। যদি আপনার অন্তর আমার কাজ সমর্থন করে, আপনার আশীর্বাদ আমি চাই। এতে আমার শক্তি যোগাবে। আশাকরি আমার মনোভাব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছি।"

(ইংরাজীতে লেখা চিঠির বাংলা অনুবাদ)

এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে গান্ধীজিকে এই বীরোচিত কাজের জন্য সমর্থন জানান। ইংরেজী টেলিগ্রামের বাংলা এইরূপ—"ভারতের ঐক্য ও সামাজিক দৃঢ়বদ্ধতা রক্ষার জন্য মূল্যবান জীবন দানও যথার্থ কাজ। আমাদের শাসকদের মনে এই কাজ কি রেখাপাত করবে জানিনা, কারণ দেশের জনসাধারণের পক্ষে এর প্রচণ্ড তাৎপর্য্য তারা নাও বুঝতে পারে। কিন্তু আমি এ-বিষয় নিশ্চিত যে এইরূপ আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠ আবেদন দেশের জনসাধারণ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করবে না, আমরা দুঃখিত হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আপনার এই তপশ্চর্য্যা লক্ষ্য করে যাব।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জনসাধারণের নিকট আবেদন করলেন, সমাজের সর্বপ্রকার অন্যায় এবং জাতিভেদের কুসংস্কার দূর করে মহাত্মার এই মহান আদর্শ ও ত্যাগকে সার্থক করে তুলতে। কেউ যদি এই মহৎ কাজে সাড়া না দেয়, তাহলে অত্যন্ত শোকবহ পরিণতির জন্য সে দায়ী হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের সমমতের ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার এই অঙ্গচ্ছেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করায় মহাত্মা গান্ধী ২৬শে সেপ্টেম্বর অনশন ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ জেলে গান্ধীজির কাছে তখন উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ দরিদ্র, দুঃখক্লিষ্ট, পরাধীন দেশ; সামাজিক অবিচার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বক্তৃতা, লেখা, সমাজহিতকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে আধুনিক, স্বনির্ভর, প্রগতিমুখী, ভয়হীন জাতিতে পরিণত করতে। তিনি তাই তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যে এই কবিতাটি লিখেছেন—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালি রাশি
বিচারের স্রোতপথে ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥"

রবীন্দ্রনাথের ভারত সম্পর্কে এই প্রার্থনা সকল দেশের পক্ষেই প্রযুজ্য হতে পারে এবং সারা পৃথিবীর সব দেশে এইরূপ চললে পৃথিবীই স্বর্গ হতে পারে। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে যখন দক্ষিণ-এশীয় দেশসমূহের সম্মেলনে এদেশে আসেন তখন ইংরেজীতে এই কবিতাটির অনুবাদটি আবৃত্তি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা মনে রেখে ভারতের যা মহত্তম তা অন্য দেশকে দিতে এবং অন্য দেশের যা সর্বোত্তম তা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সারা পৃথিবী এক হোক, বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন হোক, পূর্ব ও পশ্চিম হাত মিলাক, এই ছিল তাঁর সারা জীবনের প্রচেষ্টা। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-ও এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত। এর বাণী ছিল, "যত্র বিশ্বম্ ভবতি এক নীড়ম্।" ভারত যা মহৎ তা যেমন অপরকে দেবে, তেমনিই অন্যান্য দেশের যা মহৎ তা গ্রহণ করবে এবং এইভাবে সারা বিশ্বের সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটবে এই বিশ্বভারতীর নীড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রায় সকল দিকেই সাময়িক বসবাস করেছেন অথবা ভ্রমণ করেছেন, তাই তাঁর ভৌগোলিক ভারতের পরিচয়ও নিবিড়। জীবনের প্রথমদিকে তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয়ের পশ্চিম অঞ্চলে বহুদিন বাস করেছিলেন, জীবনের শেষ দিকে পূর্ব হিমালয়ের মংপুতে কিছুদিন ছিলেন।

পশ্চিম ভারতে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে ছিলেন সেই ঐতিহাসিক বাড়িতে যা সপ্তদশ শতাব্দীতে যুবরাজ খুরম্ (পরে সম্রাট শাজাহান)

তৈরী করিয়েছিলেন। এখানেই তিনি মধ্যযুগীয় পরিবেশে বিখ্যাত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি কল্পনা ও রচনা করেন। বোম্বাইতে ইংরেজী কথোপকথন ও আদবকায়দা শিখবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আত্মারাম-এর বাড়ীতে তিনি মাস দুয়েক থাকেন। তিনি শোলাপুর ও পরে গাজিপুর থেকে কতগুলি কবিতা রচনা করেন, যা পরে 'মানসী' নামে প্রকাশিত হয়। তিনি দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ, মহীশূর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি বহুস্থানে ভ্রমণ করেন এবং কোথাও কোথাও, যেমন তৎকালীন উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়ীতে, কিছুদিন থাকেন। উত্তর ভারতে তিনি বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি বহুস্থানে বহুবার গেছেন। পশ্চিম ভারতে পুনা, যারবেদা জেল ও সবরমতী আশ্রমেও তিনি গিয়েছিলেন; তাই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, বঙ্গোপসাগর থেকে আরব-সাগর এই সমগ্র ভারতবর্ষকেই তিনি জানতেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিদেশ যাত্রা করলেন ইংলণ্ডে—১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বরে, হয়তো ব্যারিষ্টার বা মেজদার মত আই. সি. এস্ হবার আশায়। তাঁর তৎকালীন চিঠিপত্রে তৎকালীন ইংলণ্ডের জীবনধারার কিছু ছবি ও উপলব্ধি ফুটে উঠেছে। কিছুদিন বাদে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর 'দুই দিন' কবিতায় এই ইংলণ্ডে বাস ও ফিরে আসার একটি চিত্র আছে, খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

"আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুল পত্রহীন,
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্রবাষ্পজালে গাঁথা
কুজ্ঝটি বসনখানি দেছেন টানিয়া
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।
রহিল দু'দিন।
এখনো রয়েছে শীত, বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন পরশে
সব অঙ্গ শিহরিয়া পলকে-আকুল-হিয়া
মৃত্যুশয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।
একদিন, দুইদিন ফুরাইল শেষে,

আবার ছুটিতে হল, চলিনু স্বদেশে।
এই যে ফিরানু মুখ, চলিনু পূরবে
আর কিরে এ জীবনে ফিরে আসা হবে ?
কত মুখ দেখিয়াছি, দেখিব না আর।
... ...
কিন্তু এ দুর্দিন তার শত বাহু নিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া,
দুর্দিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে
অঙ্কিত রহিবে বয়সের শিরে।"

দ্বিতীয়বার সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার পথে ইতালীর ব্রিণ্ডিসি-তে নেমে ইতালীর ফল-ফুলের বাগান আর ফরাসী দেশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে এবার অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো, কবির ভাল লাগল, তারপর কিছুদিন বাদে দেশে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে নানাবিধ কাজে অবসন্ন বোধ করে তাঁর প্রিয় পদ্মা-তীরস্থ শিলাইদহে বিশ্রামের জন্য গেলেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চৈত্রমাসে। তখন আমের মুকুলের গন্ধে আর পাখীর কূজনে প্রকৃতি মায়ের কোলে কবি শান্তি পেলেন; শরীরও সুস্থ হতে লাগল।

কবি তখন খানিকটা হাল্কা ধরণের কাজের কথা ভাবছিলেন। তাঁর মনে হলো বিগত দিনে 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতাগুলো লিখে তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা অন্য একটি ভাষার মাধ্যমে কেমন হবে ? 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতাগুলি ধীরে ধীরে ইংরেজীতে অনুবাদ করে ফেললেন এবং নূতন কতগুলি কবিতা রচনা করে বইটির নাম দিলেন 'গীতিমাল্য'; ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'-তে তিনি গীতিমাল্য থেকেও সতেরটি কবিতা নিয়েছিলেন।

১৯১২-এর মে মাসে তিনি তৃতীয়বার ইংলণ্ড গেলেন; এবারের বিলাত ভ্রমণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

বিখ্যাত বৃটিশ চিত্রকর স্যার উইলিয়াম রথেনষ্টেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আসেন, রবীন্দ্রনাথের দুই বিশিষ্ট চিত্রকর ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করতে। সে সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয় এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও খানিকটা ধারণা হয়; পরে রথেনষ্টেন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে আরও আকৃষ্ট হন।

এবার রথেনষ্টেনের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য'-এর যে ইংরেজী অনুবাদ করেছেন সেকথা রথেনষ্টেনকে জানালেন। রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ সম্বন্ধে খুব ভরসা ছিল না, তাই একটু ভয়ে ভয়ে রথেনষ্টেনের কাছে এগুলি দিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে হলেও কবিতাগুলি রথেনষ্টেনের খুব ভাল লাগল; তখন এগুলি বিশিষ্ট কবি, ডবলু. বি. ইয়েটস্-এর কাছে দিলেন, তাঁরও খুবই ভাল লাগল। এতে উৎসাহিত হয়ে রথেনষ্টেন ঐ বছরের ৩০শে জুন সন্ধ্যায় তখনকার পরিচিত ইংরেজ কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের এক সভায় আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়িতে, হ্যাম্পষ্টেড্ হাউসে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন এজরা পাউণ্ড, মে সিন্‌ক্লেয়ার, আরনেষ্ট রিজ, এ্যলিস মেনেল, হেনরী নিভেনসন, চার্লস ট্রিভেলিয়ান, ফক্স ষ্ট্রাংওয়েস্ প্রভৃতি। এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের বন্ধু ও সহকর্মী, সি. এফ এণ্ড্রুস্-এর সঙ্গেও প্রথম পরিচয় হয়।

এই বিশিষ্ট সভায় ইয়েটস্ তাঁর সুরেলা কণ্ঠে কবিতাগুলি পাঠ করেন এবং উপস্থিত সকলেই কবিতাগুলি শুনে মুগ্ধ হন। এরপরে এই কবিতাগুলির একটি সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম সংস্করণ মাত্র ৭০০ কপি, ইয়েটস্-এর ভূমিকা সহ, লণ্ডন-এর 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত হলো।

এবারে বিলাত থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ আরও বহুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হলেন—এঁদের মধ্যে ছিলেন, জর্জ বার্ণার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জন গলস্‌ওয়ার্থি, রবার্ট ব্রিজেস, জন মেস্‌ফিল্ড, ষ্টার্জ মুর, ডবলু. এইচ. হাডসন এবং ষ্টপফোর্ড ব্রুক্ প্রভৃতি। তাঁদের চিন্তাশক্তি ও উদারদৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

নোবেল প্রাইজের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম প্রস্তাব করেন—ষ্টার্জ মুর, সুইস্ একাডেমীর সদস্য, পার হলষ্টোম, এ প্রস্তাবে জোর সমর্থন জানান। আর একজন সদস্য, ভার্ণার ভন হেডেনষ্টাম্, যিনি নিজেই তিন বছর বাদে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, 'গীতাঞ্জলি'-র একটি সুইডিশ-নরওয়েজিয়ান অনুবাদ পড়ে লিখেছিলেন—"এই কবিতাগুলো পড়ে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি; গত বিশ বছর বা তারও বেশী সময়ে এর সমকক্ষ কোন গীতিকবিতা পড়েছি বলে মনে হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কবিতাগুলি আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে, মনে হয় যেন কোন নূতন নির্মল ফোয়ারার জল পান করছি। প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি অনুভূতি, প্রেম ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ; অন্তরের পবিত্রতা স্বাভাবিক মহৎ ও উন্নত

লেখনশৈলী সব মিলে এমন হয়েছে, যে সমস্তটা একটা গভীর ও দুর্লভ অধ্যাত্মবোধে পরিপূর্ণ। এ লেখায় বিতর্কমূলক বা আপত্তিকর কিছুই নেই, নেই দম্ভ, সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা বা বৈষয়িকতা। যে গুণসমূহ থাকলে কোন কবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেন, তিনি তাহাই।"

হ্যালডর ল্যাক্‌স্‌নেস্‌, যিনি পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন (তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের) লিখেছিলেন—"এই অজানিত, দূরের সূক্ষ্ম ধ্বনি আমার অধ্যাত্মবোধের মধ্য দিয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করল এবং সেই থেকে মাঝে মাঝে আমার অন্তরের গভীরে এই ধ্বনি শুনতে পাই। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পাঠকদের মনে হয়েছিল এ যেন একটি বিস্ময়কর পুষ্প যা ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি বা শুনিনি।"

১৯১২-র অক্টোবরে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন। ইলিনয়ের কাছে 'আরবানাতে' তাঁরা থাকতেন। এখানে তিনি প্রথম ইংরেজী গদ্য 'রিয়ালিজেশন অফ লাইফ' (সাধনা) রচনা করলেন, যা পরে হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন।

১৯১৩-র জানুয়ারি মাসে তিনি শিকাগো গেলেন এবং শ্রীমতী উইলিয়াম ভগহান মুডির অতিথি হয়ে থাকলেন। এই গৃহে বহু লেখক, চিত্রকর এসে থাকতেন এবং বিখ্যাত লোকেরা আমেরিকা এলে এখানে একবার আসতে আগ্রহ বোধ করতেন। তিনি লণ্ডন হয়ে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা দিয়ে দেশে ফিরে এলেন। ততদিনে তাঁর নাম অনেকেই জেনেছে।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে ১৯১৩-র ১৩ই নভেম্বর খবর এলো যে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'-র জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দেশের মধ্যেই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান—শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ, দার্জিলিং, আগ্রা, এলাহাবাদ ও কাশ্মীর। কাশ্মীরে তিনি 'বলাকা' কাব্য রচনা করেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতযশা ইতিহাস-লেখক সুকুমার সেনের মতে, গীতিকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের এই কাব্যখানা।

অল্পদিনপরেই ঐ বছরের মে, জুন, জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বমানবের কল্যাণ যাঁর একান্ত কামনা তিনি মানবজাতির এই সংকটে অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করলেন। একটি কবিতায় তিনি তাঁর তখনকার মনোভাব প্রকাশ করলেন, কতক অংশ উদ্ধৃত করছি -

"দূর হতে কি, শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল,
বহ্নি-বন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস—ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী ।"

আবার "ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি, মাথা করো নত,
এ আমার, এ তোমার পাপ,
... ...
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া ।।"

'বলাকা', ৩৭

১৯১৮-র ৯ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করা হয়। যুদ্ধ তখনও চলেছে; একটি জাপানী জাহাজে চড়ে তিনি জাপান রওনা হলেন। এই জাহাজের ক্যাপ্টেন ও কর্মীদের অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবহার দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। রেঙ্গুনে জাহাজটি দুদিন থামে, সেখানে মহিলাকর্মীদের সুন্দর, সুঠাম চেহারা এবং সুন্দর পোশাক এবং কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "এরা যেন সারা দেশে ফুলের মতো ফুটে আছে, গাছের শাখায়ই হোক, আর মাটিতেই হোক, আর কিছু যেন চোখে পড়ছে না।" হংকংয়ে তিনি আরও খুসি হয়েছিলেন এই দেখে যে সুসংগঠিত শারীরিক শ্রম মানুষের দেহে কি শক্তি ও জৌলুস এনে দিতে পারে।

চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণীয়, "প্রাণ, শক্তি, দক্ষতা, কাজের আনন্দ কর্মীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যা এই মহান জাতির ভবিষ্যৎ শক্তির ভাণ্ডার হয়ে উঠবে। যখন আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তি এদের কবলে আসবে, তখন এই জাতিকে রুখবে কে?"

২৯শে মে সদলে রবীন্দ্রনাথ জাপানের কোবেতে পৌছোলেন; সেখানে তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানানো হলো। তাঁকে নিতে এলেন জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর, তাইকোয়ান, যিনি ইতিপূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। যদিও জাপানীরা প্রথমে কবিকে বুদ্ধের দেশ থেকে আসা ভাবীদর্শী কবিরূপে সম্বর্ধনা জানালেন, কিন্তু সে উত্তাপ ও আবেগ কমে এল, যখন রবীন্দ্রনাথ বললেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মানবিক দিক গ্রহণ না করে তাঁদের ক্ষমতার লোভ এবং জাতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বার্থান্ধভাবে পরিচালনা-কে অনুকরণ করা, ঠিক হবে না। জাপানে বক্তৃতাতে তিনি ভারত যে যুগ যুগ ধরে মানব-ঐক্যের চেষ্টা করেছে তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। 'আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সে সব দিনের কথা যখন সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় ভারত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে যুক্ত হয়েছিল, ব্রহ্মদেশ থেকে জাপান পর্যন্ত। এটাই জাতিতে জাতিতে মিলনের স্বাভাবিক পথ। মানুষের যে গভীরতম প্রয়োজন তা সাধনের জন্য হৃদয়ে হৃদয়ে যোগাযোগ ও মিলনের একটি সজীব সাধনা চলছিল। আমাদের দেশ কোন জাতি বা দেশ সম্বন্ধে শঙ্কা করত না, কাজেই অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। অপরদিকে অপর জাতিকে শোষণ বা লুণ্ঠনেরও কোন চিন্তা ছিল না। ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান, ভালবাসার উপহার ছিল স্বাভাবিক, কোন স্বার্থপ্রসূত নয়,—ভাষা ও আচারের ব্যবধান আমাদের আন্তরিক মিলনে কোন বাধা ঘটায়নি, জাতিগত অহংকার অথবা উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অহংবোধ-এ সম্পর্ক-কে মলিন করেনি। এই হৃদয়ের মিলনের সূর্যালোকে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য নূতন পত্রপুষ্পে সজ্জিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন ইতিহাসের মানবগোষ্ঠী সর্বমানুষের ঐক্য ও প্রেমকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিল।" (ইংরেজী বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ)

যে জাতীয়তাবাদ মানবমিলনের বিরোধী, তাকে তিনি বিপজ্জনক মনে করতেন। একটি সুসংগঠিত জাতি, যারা শুধু দক্ষতা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত, তাদের মানুষের আত্মত্যাগ ও মহত্ত্বের দিক ক্ষুণ্ণ হয়। এই শক্তি মানবকল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে অপরের শংকার কারণ হয়। শুধু যান্ত্রিক সংগঠন জাতিগত

স্বার্থে নিয়োজিত হলে মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। জাপান, জার্মাণ ও ইতালীর এই জঙ্গীবাদ তাদের যে ক্ষতির কারণ হয়েছিল, তা আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ করেছি।

জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথ গেলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। 'পণ্ড লিসিয়াম' নামে একটি সংস্থা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল অবধি বক্তৃতার ব্যবস্থা করল। তাঁর 'শিল্প কি' ? 'ব্যক্তিজগৎ', 'দ্বিজত্ব', 'আমার বিদ্যালয়', 'সাধনা', 'নারী', প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি বিশেষ প্রশংসিত হয়,—তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ়তার জন্য। কিন্তু সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদকে যখন তিনি নিন্দা করলেন, তখন সেখানকার সংবাদপত্রে তার জোর প্রতিবাদ জানানো হলো।

এদিকে পাঞ্জাবের গদর পার্টির যারা যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছিল তারা অভিযোগ করল যে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তাবিরোধী বৃটেনের নিযুক্ত প্রচারক। তাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং এত ছুটোছুটিতে অসুস্থ বোধ করায় তিনি তাঁর বক্তৃতার বাকি অংশের চুক্তি বাতিল করে, জাপানে মাসখানেক থেকে, ১৯১৭র মার্চে ভারতে ফিরে এলেন।

আমেরিকায় ও জাপানে সংগ্রামমুখী (chauvinistic) 'জাতীয়তাবাদ'-এর নিন্দা করে দেশে ফিরে দেখলেন যে বৃটিশ যুবকরা যখন দেশের জন্য লড়াইয়ে প্রাণ দিচ্ছে, তখন ভারতে নির্বিচারে নিপীড়ন চলছে। কলকাতায় একটি জনসভায় তিনি সদ্যরচিত এই কবিতাটি পড়লেন—

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে।"

এটি ৫টি স্তবকের পূর্ণ কবিতাটির মাত্র প্রথম স্তবক।

১৯২১ থেকে ১৯৩১-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমন করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল য়ুরোপের রাশিয়া সহ প্রায় সব দেশ, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, মিশর, ইরান, ইরাক, এবং দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার বহুদেশ। চীন ও জাপানে, তিনি এর পূর্বেই গিয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে বিদগ্ধ ব্যক্তিরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গুণগ্রাহী, স্যার উইলিয়াম

রথেনস্টেন ; তাঁর মাধ্যমেই পরিচয় হয় এজরাপাউণ্ড, জর্জ রাসেল (এ, ই) ষ্টার্জ মূর, গিলবার্ট মারে—প্রভৃতির সঙ্গে। পরে পরিচয় হয় বার্টাণ্ড রাসেল, জর্জ বার্ণর্ড শ এবং এইচ, জি, ওয়েলস্ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে। ফ্রান্সে রোঁমা রোঁলা, আণ্ড্রে গাইড (যিনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন), কাউন্টেস দে নোয়ালিশ, পল ভ্যালেরি প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদগণ এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে রবীন্দ্রনাককে স্বকীতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর বাণীতে সাড়া দিয়েছিলেন।

ডঃ আরন্সনের মতে ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে সাধারণ পাঠকরা তেমন সাড়া দেয়নি সংস্কারগত ও রাজনৈতিক কতগুলি মানসিক বাধা-নিষেধের জন্য।

জার্মাণীতে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন ছিল দর্শনীয় ও উচ্ছ্বাসময়। ৩/৬/১৯২১ তারিখের লণ্ডনের 'ডেইলী নিউজ'-এর বিবরণ অনুসারে জার্মানীতে সর্বপ্রথম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ যেদিন বক্তৃতা দিলেন, সেদিন দেখা গেল উদ্‌ভ্রান্ত বীরপূজার দৃশ্য। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আসন সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়লো এবং পায়ের তলায় পিষ্ট হল।

লণ্ডনের "ইভনিং পোষ্ট"-এর হিসাব অনুসারে ১৯২১-এর অক্টোবরের মধ্যে জার্মানীতে আটলক্ষের বেশী রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি হয়েছিল। ডঃ আরন্সন্ লিখেছেন, 'ইউরোপের বুদ্ধিজীবী লোকেরা' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরে স্থির বুঝেছিলেন যে শুধু আদর্শই য়ুরোপকে বাঁচাতে পারবে এবং সেজন্য চাই আর এক নবজাগরণ—য়ুরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের পুনরুজ্জীবন। কাজেই সারা য়ুরোপ বিশেষতঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথকে মনে করা হতো যে প্রাচ্য থেকে এক ধর্মপ্রবক্তা সদিচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে এসেছেন। ইতালী থেকে নিমন্ত্রণ এল, তাই সেদেশে যাবার জন্য ১৯২৬-এর ১৫ই মে সদলবলে রবীন্দ্রনাথ রওনা হলেন 'নেপলসে'। তাঁদেরকে রাজকীয় অভিনন্দন দেয়া হলো। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে মুসোলিনী একজন মহান ব্যক্তি, যখন তাঁর লিখিত বাণী চাওয়া হলো, তিনি লিখলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখছি যে এই অগ্নিপরীক্ষার পর ইতালীর অমর আত্মা অনির্বাণ আলোকে উদ্ভাসিত হবে।' যখন তাঁকে রাজকীয় মর্যাদায় সারা দেশে ঘোরানো হচ্ছিল তখন তিনি জানতেন না যে তাঁর বক্তৃতার ও সাক্ষাৎকারের কথাগুলি বিকৃতভাবে ফ্যাসিষ্ট শাসনের অনুকূলে ইতালীয় প্রেসে ছাপা হচ্ছিল।

রোমাঁ রোঁলা তখন সুইজারল্যাণ্ডের ভিলেনুয়েভেতে বাস করছিলেন। তিনি

বারবার রবীন্দ্রনাথকে জরুরী চিঠি দিলেন সেখানে যাওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে কবি বুঝতে পারলেন যে ইতালীয় প্রচারযন্ত্র তাঁকে বোকা বানিয়েছে। শুধু রোঁমা রোঁলা নয়, জর্জ ডুহামেল, জে. পি. ফ্রেজার, ফোরেল, বোভেট এবং অন্যান্যরা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ইচ্ছাকৃতভাবে ছাপিয়ে ফ্যাসিষ্ট শাসনের স্বপক্ষে দেখানোর কু-প্রচেষ্টার কথা তাঁর কাছে তুলে ধরেন। এসব জেনে ও বুঝতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদকে নিন্দার্হ বলে 'ম্যানচেষ্টার গর্ডিয়ান'-এ একখানা পত্র লেখেন। এই চিঠি ছাপা হলে সারা ইতালীয় প্রেস রবীন্দ্রনাথের নিন্দাবাদ শুরু করে।

ইতালীতে যাওয়ার একমাত্র সুফল হলো, বিখ্যাত চিত্রকর ক্রোচে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ; ক্রোচে তখন গৃহবন্দী ছিলেন। 'লিওনার্দো দ্যা ভিন্সি সোসাইটি'-ও তাঁর সম্মানে একটি প্রকাশ্য সম্বর্ধনা সভা করে। ভিলেনুয়েভে থেকে তিনি জুরিক গেলেন। সেখানে তিনি একটি সভায় বক্তৃতা করলেন এবং কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করলেন। এরপরে সপ্তাহ তিনেক ইংলণ্ডে থেকে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন। অসলো-তে নরওয়ের রাজা তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন এবং অনেক বিখ্যাত লেখক—ন্যানসেন, বোজার প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। তিনি সেদেশে বেশ কয়েকটি বক্তৃতাও দিলেন। তারপর গেলেন ষ্টকহোল্মে যেখানে সোয়েন হেডিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো, এরপর কোপেনহেগেন-এ আলাপ হল জর্জ ব্রাণ্ডিস এবং দার্শনিক হফডিংয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার চললেন জার্মাণী—এবারও তাঁর সম্বর্ধনা হলো উচ্ছ্বাসময়, সর্বত্র তাঁর জয়জয়কার, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ তাঁকে আমন্ত্রণ করে সাক্ষাৎ করলেন এবং কথাবার্তা চলল। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন-এর সঙ্গে এবার তাঁর প্রথম পরিচয় হলো। তারপরে সপ্তাহখানেক থাকলেন প্রাগে, সেখানে তাঁর বক্তৃতা ছাড়াও তাঁর 'ডাকঘর' নাটকটি চেক ভাষায় মঞ্চস্থ হলো। এবার তিনি চললেন ভিয়েনা হয়ে বুডাপেষ্ট। বহু যাতায়াত ও কাজকর্মের জন্য তাঁর স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় লেক ব্যানাটনের সমীপবর্তী একটি স্বাস্থ্য নিবাসে তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। কয়েকদিন বিশ্রামের পর বহুজনের সম্বর্ধনা ও বহু বক্তৃতা চলল বেলগ্রেড, সোফিয়া ও বুকারেষ্টে; তারপর গ্রীসে গেলে গ্রীক সরকার তাঁকে 'অর্ডার অফ দি রিডিমার' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর মিশরে; সেখানে পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলছিল; কবির সম্মানে অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো। রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেকগুলি আরবী বই উপহার দিলেন। ঐ বছরের ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

পরবর্তী দুমাসের মধ্যে পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ এল। জাহাজে রওনা হলেন, কিন্তু কিছুদিন বাদে হৃদযন্ত্রের পীড়ায় হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায়, ডাক্তারের নির্দেশে তিনি আর্জেনটিনার বুয়েনস্ আয়ার্সে নেবে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের জানা তেমন কেউ ছিলেন না, কিন্তু ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো প্লেট নদীর তীরবর্তী 'স্যান হসিডিরো'-তে তাঁকে আশ্রয় দিলেন; শুধু আশ্রয় নয়, ভক্তিপূর্ণ, সতত যত্নে ৫০ দিন সেখানে কাটালেন এবং বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করলেন। মুগ্ধ হয়ে কবি 'ভিক্টোরিয়া-র' বাংলা নাম দিলেন 'বিজয়া'।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর নবম বিদেশ ভ্রমণে বেরুলেন এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতের নিকটবর্তী দেশগুলি। সিঙ্গাপুর, মালয়া, কুয়ালালামপুর, ঈপো, তাইপিং ও পেনাংয়ে—তিনি সর্বত্র পেলেন বহুজনের আন্তরিক সম্বর্ধনা এবং দলে দলে লোক এলো তাঁকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে। এরপর গেলেন জাহাজে চড়ে ইন্দোনেশিয়া। জাহাজে থেকেই তিনি লিখলেন জাভা সম্বন্ধে একটি সুন্দর দীর্ঘ, কবিতা। এই কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ তিনি পড়লেন তাঁর সম্মানে আয়োজিত জাকার্তার একটি ভোজসভায়। জাভায় অনেকের মধ্যে তাঁর দেখা হলো আকমেদ সুকর্ণের সঙ্গে, সুকর্ণ ভবিষ্যতে জাভার ভাগ্যবিধাতা হলেও, তখন অবধি তেমন পরিচিত ছিলেন না। জাভা ও বালিতে তাঁদের নৃত্যনাট্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন, তাঁর আরও আনন্দ হলো ভারতীয় প্রাচীন জীবনধারার সঙ্গে এসবের সান্নিধ্য দেখে। জাভা সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির কয়েকটি পঙ্ক্তি তুলে ধরছি—

'বিজয়লক্ষ্মী'

"তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
... ...
এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে,
... ...
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো
নূতন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।"

'বোরোবুদুর' কবিতার শেষ স্তবকটি এরূপ:

"সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র, 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

'সিয়াম' (প্রথম দর্শনে) কবিতাটির শেষ ক-টি পঙক্তি এরূপ—

"তোমার জীবন ধারাস্রোতে
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ-পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গল দিনকর।"

"সাগরিকা"

'বালী' কবিতার শেষ দু লাইন—

"এনেছি শুধু বীণা—
দেখতো চেয়ে, আমারে তুমি চিনতে পারো কিনা।"'

কানাডার জাতীয় শিক্ষাসংসদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, ১লা মার্চ, জাহাজে কানাডা রওনা হলেন। সেখানে তিনি দুটি বক্তৃতা দিলেন—একটি ভিক্টোরিয়া শহরে, বক্তৃতার শিরোনাম, 'দি ফিলোজফি অফ লিজার', । আর একটি ভ্যানকুভার-এ। 'ভ্যানকুভার সান'-এ লেখা হলো "সম্মেলনে অন্য কোন প্রতিনিধির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শ্রোতাদের কল্পনাকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছিলো, তাঁর কারণ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ।" ক্লিফোর্ড ডাউলিং 'ভ্যানকুভার ষ্টার'-এ লিখলেন, "আমার জীবনে প্রথম সেই কবিকে দেখলাম যাঁর চেহারা ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।"

১৯৩০ সনে সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রনে রবীন্দ্রনাথ মস্কো গেলেন। তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন—অমিয় চক্রবর্তী, আর্যনায়কম্, সৌমেন ঠাকুর ও কুমারী আইনষ্টিন। মানব-সভ্যতার এই নূতন ব্যবস্থাপনায় তিনি আগ্রহ ও বিস্ময়বোধ করেছিলেন।

তাঁর সুদীর্ঘ 'রাশিয়ার চিঠি'তে অনেক মূল্যবান কথা আছে—শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বহু বিষয়ে। কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি—"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।"

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেরই আজ আত্মসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটি দেখে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কি আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।"

"আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলাম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে, আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা—কেবলমাত্র মাথাগুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকারকমের শিক্ষা মানুষ করে তোলার উপযুক্ত। নোট মুখস্থ করে এম. এ পাস করবার মত নয়।" "এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়াঢাকা পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে; এরা যে প্রথম ভাগ পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষর হাতড়ে বেড়াতে শিখেছে, এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হল না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এ ক-টা বছরেই (১৯১৭—১৯৩০)।

রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন একদিন রাশিয়ার একটি 'পায়োনিয়রস্ কম্যুন' দেখতে। তিনি লিখছেন, "আমাদের শান্তিনিকেতনে যে রকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের 'পায়োনিয়রস্' দল কতকটা সেই ধরণের। বাড়ীতে প্রবেশ করেই দেখি, আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দুধারে বালক-বালিকার দল সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে আসতেই ওরা চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো, এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোন সত্যের

দাবি করতে পারত না, পুরোহিতরা হবে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের, অসম্মানের ছায়া-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই, তা ছাড়া সকলের মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয়; যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে। কোন কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।" এই শিশুদের মধ্যেই ছিল আলেকজাণ্ডার ফিলাটভ, যে পরে রাশিয়ায় বিখ্যাত কবি হয়েছিল।

এবার রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বারের জন্য চললেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, এটাই তাঁর এদেশে শেষ যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ ততদিনে বিশ্ববন্দিত ব্যক্তি, তাই এদেশেও তাঁর জোর সম্বর্ধনা হলো। প্রথম ও দ্বিতীয়বার তিনি তেমন সমাদর পাননি। ১৯৩০-এর ২৫শে নভেম্বর বাল্টমোর হোটেলে নিউ ইয়র্কের চারশত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁকে এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। কার্নেগী হলেও তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়: সেখানে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন। রুথ সেন্ট ডেনিস শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহকল্পে নৃত্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু যেহেতু সেই দেশে তখন আর্থিক সংকট চলছিল, তাই তিনি সংগৃহীত অর্থ নিউইয়র্কে বেকারদের সাহায্যে দান করলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো নিউইয়র্ক, বোস্টন ও ওয়াশিংটনে। ওয়াশিংটনে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট হুভার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। উইল ডুরান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আনন্দিত হলেন। উইল ডুরান্টের বই, 'এ কেস ফর ইণ্ডিয়া', রবীন্দ্রনাথের নামে বইটা দিয়ে, তাতে ডুরান্ট লিখেছিলেন, "আপনি একাই যথেষ্ট কারণ যার জন্য ভারত স্বাধীন হওয়া উচিত।" এই বই বৃটিশ সরকার বঙ্গদেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন হয়ে ভারতে ফিরলেন ১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসে। লণ্ডনে 'হাইড পার্ক হোটেল'-এ বার্ণার্ড শ-র সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হলো। এই ভ্রমণই তাঁর জীবনে শেষ পাশ্চাত্য ভ্রমণ।

রবীন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ ও দুর্বল এবং বিদেশ যাত্রায় আর আগ্রহ ছিল না। তবুও ইরানের রাজা, রেজা শাহ পহ্লবীর নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাই ১৯৩২-এর ১১ই এপ্রিল উড়োজাহাজে তিনি ইরাণ যাত্রা করলেন। তিনি প্রথমে বুশায়ারে নামলেন, সাধারণ জনসাধারণের আন্তরিক অভ্যর্থনায় তিনি মুগ্ধ হলেন। বুশায়ার থেকে তিনি গেলেন শিরাজ, সেখানে বিখ্যাত পারসিক কবি হাফিজ ও সাদি-র সমাধিস্থলে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন। ইস্পাহানে পার্লিয়ামেন্ট

থেকে, তিনি স্থলপথে তেহেরান পৌঁছলেন, ২৯শে এপ্রিল ; সেখানে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হলো। খবরের কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে পূর্বাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র রূপে বর্ণনা করা হলো। তেহেরানে থাকা কালে, ৬ই মে, তাঁর জন্মদিন পালিত হলো ; তাঁকে যে বিপুল প্রীতি ও সম্মান দেখানো হলো তাতে তিনি অভিভূত হলেন। তিনি তাঁর বিদায় সম্ভাষণে তাঁর এই অভিভূত মনোভাব প্রকাশ করেন। ভারতে ফেরার পথে তিনি বাগদাদে যাত্রা বিরতি করলেন। "খাঁজা ফৈজাগ খান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, সেখানে তাঁর যৌবনের স্বপ্ন, 'যদি আমি হতেম আরব বেদুইন' সার্থক হলো, যখন ইরাকে তিনি এক বেদুইন শিবিরে একদিন কাটালেন।

রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী'-কে বিশ্ব-সংস্কৃতির এক মহামিলনক্ষেত্ররূপে পরিকল্পনা করেছিলেন।

চীনদেশের ভাষা, ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি অনুধাবনের জন্য 'চীনাভবন' প্রতিষ্ঠা করে বিশিষ্ট চীনদেশীয় পণ্ডিতদের তিনি আহ্বান জানান। জাপান থেকে যুযুৎসু, জাভা থেকে বাটিক শিল্প, তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

অনেক স্থায়ী বা পরিদর্শক অধ্যাপক বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এণ্ডরুজ, পিয়ারসন্, এলমহার্স্ট স্থায়ী অধ্যাপক ছিলেন। ফরাসী দেশ থেকে সিলভাঁ লেভি, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ভি. লেস্‌নি, ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড টম্‌সন ; ইতালী থেকে প্রাচ্যসংস্কৃতি গবেষক—কার্লো ফরমিসি ও গিয়োসেপ্পে টুকি, প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোরিজ উইনটারনিজ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ষ্টেলা ক্রামরিচ্, ফরাসী ও সুইস ভাষা বিশেষজ্ঞ এক্ বেনয়েট ; রাশিয়া থেকে এলেন, বোগডানভ, পারস্য থেকে পোরে দাবুদ, স্কটল্যাণ্ড থেকে আর্থার গেডিডস্, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ষ্ট্যানলী জোনস্ ও কুমারী গ্রেচেন গ্রীন ; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদী মহিলা, কুমারী এস্ ফ্লুমি প্রভৃতি বহু গুণী ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের মানবসংহতির মহাসাধক, তিনি ভারতের প্রাচীন গৌরবে এবং মানবহিতৈষণায় যেমন আস্থাশীল ছিলেন, তেমনি বিশ্বসভ্যতায় য়ুরোপের দান সম্বন্ধেও বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জাপানে বক্তৃতা কালে তিনি বলেছিলেন, "আমরা য়ুরোপকে সারা অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা না করে পারিনা এবং আমাদের [illegible] যখন সেই য়ুরোপকে তার সাহিত্য-শিল্পে [illegible] অপূর্ব [illegible]

সারা পৃথিবীকে সর্বকালের জন্য ঋণগ্রস্ত করে রেখেছে ; যে য়ুরোপ অসীম, অক্লান্ত শক্তি নিয়ে পৃথিবীর উচ্চতম ও নিম্নতম অঞ্চলে, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বস্তুর জ্ঞান আহরণ করছে, যে তার হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যাধি ও বেদনা দূর করা এবং মানুষের দুঃখ নিবারণে অক্লান্তভাবে এগিয়ে চলেছে—যা ইতিপূর্বে অসাধ্য বলে মনে হতো ; যে য়ুরোপ প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করে এমন উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে যা পূর্বে কল্পনাতীত ছিল" (ইংরেজীর অনুবাদ)।

রবীন্দ্রনাথ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে উভয়ের যা সর্বোত্তম তার আদান-প্রদানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন,—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥"

তাঁর মতে একটা জাতির কর্তব্য শক্তি ও রাজ্যের প্রসার নয় ; বরং নিজস্ব শক্তির মহত্তম বিকাশ, এবং সব শক্তি দিয়ে সারা বিশ্বের আলোকবৃদ্ধি ; মানুষে মানুষে বিভেদ, অত্যাচার, যুদ্ধ ও দুঃখ বৃদ্ধি নয়।

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন এবং তাঁকে বলতেন 'ভারতের মহান প্রহরী', রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবজাতির মহান প্রহরী ছিলেন, এবং যে দেশে যখনই অন্যায় ও অত্যাচার দেখতেন তখনই তাঁর ব্যথিত মন প্রবল প্রতিবাদ জানাত।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে 'সিডিশন বিল' পাশ করা হয়। এই আইনের বলে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা 'বাল গঙ্গাধর তিলক'-কে আটক করা হলো, তখন কলকাতার এক প্রতিবাদ সভায় কবি তাঁর বিখ্যাত 'কণ্ঠরোধ' লেখাটি পাঠ করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি ভারত সরকারের অন্যায় নিপীড়নমূলক আচরণের প্রবল প্রতিবাদ জানান এবং তিলকের আইনগত সমর্থনের জন্য যে ব্যয় প্রয়োজন তা সংগ্রহের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

বুয়র যুদ্ধ আবার কবির প্রাণে ব্যথা দিল। উনিশ শতকের শেষ দিনে স্বার্থান্ধ বলদৃপ্ত শক্তির হিংস্র আচরণের প্রতিবাদে তিনি লিখলেন—

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী

ভয়ংকরী ! দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা, শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"

পরের কবিতাটিতে (৬৫ নং, নৈবেদ্য) লেখেন,—

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।......

... ...

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগে পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি "স্যার" উপাধি ত্যাগ করেন।

মুসোলিনী যখন অতর্কিতভাবে ইথিওপিয়া আক্রমণ করলেন, রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত চিত্তে 'আফ্রিকা' কবিতাটি লিখলেন, কারণ মানবিক প্রেম ও দুর্বলকে সহায়তা দানই তিনি মহান কর্তব্য মনে করতেন ; রাজ্যলোলুপতা ও স্বার্থান্ধ পরদেশ আক্রমণ তিনি অমানবিক কাজ মনে করতেন। বৃহৎ কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যুর পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।
সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সঙ্গীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।
আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি ;
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে ;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।"

১৯৩৭-এর আগষ্টে কলকাতায় একটি প্রকাণ্ড জনসভায় আন্দামানে নির্বাসিত রাজবন্দীদের যে নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে অনশন বরণ করতে হল, সেই আচরণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানালেন রবীন্দ্রনাথ।

জাপান যখন চীন আক্রমণ করল সাম্রাজ্যের লোভে, তখন এই যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে নিন্দা করে তিনি জাপানী কবি নোগুচিকে একখানা পত্র দিলেন ; কিছুদিন পূর্বে একটা বড় অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করে ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাপানের এই নিষ্ঠুর আগ্রাসী আক্রমণে তিনি গভীর ব্যথা পেলেন ; জাপানের অগ্রগতিতে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন এবং এশিয়ার নব-সূর্যোদয় বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই-জাপান এশিয়ার

বিপদস্বরূপ হবে এই প্রয়োজন উদ্ভব খুব শীঘ্র নয়।" জাপানী কবি নোগুচি, যিনি ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন, তিনি যখন জাপানের এই কাজকে মহদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে লিখলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ধৈর্য হারালেন এবং স্পষ্টভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে নোগুচিকে পত্র দিলেন—"আপনারা এশিয়াকে নূতন করে গড়তে চেয়েছেন তা কি মানুষের মাথার খুলির উপর গড়বেন? তৈমুরলঙ্গ নির্বিচারে নরহত্যায় যে আনন্দ পেত জাপানের চীন আক্রমণও তেমনই ভয়ংকর ও নিন্দার্হ। জাপানে বক্তৃতাকালে পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদ, লোভ ও মানবপীড়নের নিন্দা করে, আমি বুদ্ধ ও খৃষ্টের মানবিক কল্যাণের আদর্শের কথা বলেছিলাম—যে নীতি অনুসরণ করে সারা এশিয়ায় সৌভ্রাতৃত্বমূলক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমি কৃষ্টিতোয় দেশকে, শিল্প-সংস্কৃতিতে ও মহান বীরত্বে উদ্ভাসিত জাপানকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-প্রভাবিত বর্বরতা ও মানবিকতার অপমানের ও নৈতিক অধঃপতনের বিষয় সতর্ক করে দিয়েছিলুম এবং বলেছিলুম যে এই মহান পুনর্জাগ্রত দেশের সবল, সক্ষম জনসাধারণ যেন নূতন সৃষ্টিধর্মী ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে, পশ্চিমের মানবহন্তা অনৈতিক পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে।

'এশিয়ানদের জন্য এশিয়া' যা আপনার পত্রে বর্ণনা করেছেন, তা বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর সান্নিধ্য ও মৈত্রীর বাণী নয়, তা ইউরোপের রাজনৈতিক আগ্রাসী নীতিরই অনুরূপ। সেদিন টোকিও-র এক রাজনৈতিক নেতার বিবৃতি পড়ে আমার মজা লাগল এই জেনে যে টোকিও-র জার্মাণী ও ইতালীর সঙ্গে সম্মিলিত লড়াইয়ের চুক্তি মহৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কারণপ্রসূত। কিন্তু এটা মজার কথা নয় যে শিল্পী ও চিন্তাবিদেরা এহেন উক্তিকে সমর্থন করে লড়াইয়ের আস্ফালনকে নৈতিক সমর্থন জানাবে। প্রতীচ্যে যুদ্ধের সংকটময় দিনগুলিতেও কখনও সেসকল মানবতাবাদী মহানপুরুষদের অভাব হয়নি যাঁরা লড়াইবাজদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ সকল ব্যক্তিদের কষ্টভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা বিবেক বিক্রয় করেননি কোন অবস্থাতেই। এশিয়াবাসী পাশ্চাত্যের দুর্বলতায় ধরা পড়বে না, যদি তারা এইরূপ মহান লোকদের কাছে শিক্ষা নেয়।

আমায় ক্ষমা করবেন যদি আমার কথাগুলি তিক্ত মনে হয়—ক্রোধ নয়, দুঃখ ও লজ্জা আমাকে এরূপ লিখতে বাধ্য করেছে। শুধু চীনাদের দুঃখ-বেদনা আমার হৃদয়কে আঘাত করছেনা, আমার দুঃসহ বেদনা এই যে জাপানকে আমি যে গর্ব নিয়ে মহান জাপান বলতাম, তা আর বলতে পারব না। একথা সত্য যে কোন উচ্চতর মান বর্তমান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই এবং য়ুরোপের দুর্দান্ত জাতিরা

এ ব্যাপারে আরও বর্বর এবং নিষ্ঠুরতর অপেক্ষা। [illegible]
কিছু বলার থাকতো ; কিন্তু আমার তাব [illegible] দেখাতে পারতাম ; আমাদের দেশের লোকের কথা আমি বলতে চাই না, কারণ আমাদের আদর্শ শেষ অবধি স্থির থাকলে, তবেই তা বলা যাবে। আপনার দেশবাসীকে আমি ভালবাসি, লড়াইয়ের পথে আমি তাদের সাফল্য কামনা করি না, চাই অনুতাপ।

ইতি ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"।

এ সময় তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন ক্ষোভে ও দুঃখে। খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

"যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে,
ওদের ঘাড় হলো বাঁকা, চোখ হলো রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়,
বেজে উঠল তূরী, ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।
... ...
ওরা হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে
ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।
ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যামন্ত্র দিতে,
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিঃশ্বাসে।" (পত্রপুট—সতেরো)

যখন হিটলারের গাঁজোয়া বাহিনী অতর্কিতে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করল, তখন রবীন্দ্রনাথ সেই দেশের মনীষি অধ্যাপক লেসনিকে লিখলেন—"এই

তাঁদেরকে আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো শক্তি আমার হাতে নেই, যারা একদিন মানবজাতির পরিত্রাতার রূপে দেখা দেবে তাদের এই সংকট মুহূর্তে বাঁচিয়ে রাখার, ও কিছু করার শক্তি আমার নেই। আমি খুবই অপমানিত ও নিঃসহায় বোধ করছি।"

তিনি ইতিপূর্বেই বিধাতার কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন—

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে' বলে গেল 'ভালবাসো'—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে; বাঁশি সঙ্গীত হারা।
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

১৯৪০-এর ৭ই আগষ্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করার জন্য, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত হলেন তৎকালীন ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গওয়ার, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক হেণ্ডারসন। উল্লেখপত্রে লেখা ছিল, সব কাব্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের অতি প্রিয়—'Most dear to all the Muses) মরিস-গওয়ার বললেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে আমরা আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করছি, সে বিশ্ববিদ্যালয়ও এতে গৌরব বোধ করছে।"

রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি লিখলেন—

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি—

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম ব্যাধি এল ১৯৪১-এর জুলাই মাসে, তাঁকে কলকাতায় নেয়া হলো চিকিৎসার জন্য, তাঁর অপারেশনের ব্যবস্থা করা হলো তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ৩০শে জুলাই অপারেশন টেবিলে যাওয়ার ঠিক পূর্বে তাঁর জীবনের শেষ কবিতা তিনি বলে গেলেন যা লেখা হলো এরূপ—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী,
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

... ...

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারি না তারে প্রবঞ্চিতে।
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে

আপন অন্তরে ।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ।"

১৯৪১-এর ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এটা বাংলায় ২২শে শ্রাবণ। ১৯৩৯-এর ৩রা ডিসেম্বর তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর মৃত্যুদিনে যেন এটা গান করা হয়। আজকালও প্রতি বৎসর ২২শে শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে, এ গান গাওয়া হয়ে আসছে—

"সম্মুখে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলে লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা-অজানার।"

ডঃ আরন্‌সন্ তাঁর "রবীন্দ্রনাথ থ্রু ওয়েষ্টার্ণ আইজ" বইতে লিখেছেন "যখন তাঁর মৃত্যুর বেদনাদায়ক সংবাদ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন কেউ প্রকাশ্য স্থানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, জাতীয় চিত্রশালায় তাঁর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁর স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু এ সমস্ত কাজই সেসব লোকের যারা যুদ্ধের বিভীষিকায় বেদনাহত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এরকম স্মৃতিসৌধ এবং সস্তা সম্মান প্রদর্শন বা স্তুতিজ্ঞাপনকে ভাল মনে করতেন না। তিনি মানুষের পরিপক্ক মনের ধীরতা ও স্থিরতা এবং শান্তিকামনা করতেন—যে মনোভাব আসে সমগ্র সৃষ্ট জগতের মঙ্গলের আদর্শে এবং চিন্তায় ও কর্মে এই উপলব্ধিতে।" (বাংলা অনুবাদ)

জেনওয়ে হাউস থেকে ১৯৩৫-এর ২০শে মে রবীন্দ্রনাথকে লেখা টমাস্ ষ্টার্জ

যুদ্ধের চিঠি, যা আমিই প্রথম প্রকাশ করেছিলাম, তার একেবারে বিপরীত মনোভাবাপন্ন—যুদ্ধের ঠিক পরেই একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল আশা ও উদারতার দিকে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জনসাধারণ এখন আর আধ্যাত্মিকতা ও সুন্দরের উপাসক নয়, কিন্তু বিদ্বেষ, বিদ্রূপ, অনাস্থা, যান্ত্রিকতা ও যান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা এখন সাধারণ ভাবধারা। আপনার চিন্তা ও উপদেশ যুদ্ধের ঠিক পরেই মানবসমাজকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল এখন বর্তমান ভাবধারায় তা বিস্বাদ হয়ে গেছে। আপনার বক্তৃতায় ও লেখায় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে অসংখ্য মানুষেরা প্রভাবিত হয়েছিল এবং আপনাকে স্বচক্ষে দেখেছিল সে যুগ আর থাকবে না। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, আপনি জীবদ্দশায় যেমন অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, আপনার মৃত্যুর পরেও সেরূপ অগণিত মানুষ, যারা আপনাকে আর চোখে দেখতে পাবে না, তারা আরও বিস্তৃতভাবে আপনার মতবাদে বিশ্বাসী হবে, কাজেই আপনি কবিদের মধ্যে অত্যন্ত ভাগ্যবানদের অন্যতম।"

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিখ্যাত লোকদের অভিমত সংগ্রহ করে 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর' নামে একটি পুস্তিকা রবীন্দ্রনাথের সপ্ততম জন্মবার্ষিকী-তে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। সেই পুস্তিকা থেকে বিশেষ কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করছি—বার্ণাণ্ড রাসেল লিখেছিলেন, "বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির অত্যন্ত মূল্যবান কাজ তিনি যেমন করেছেন, তেমন এ যুগে আর কেউ করেন নি। তিনি ভারতের জন্য কি করেছেন, তা আমার বলবার কথা নয়, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার ভুল ধারণা দূর করার জন্য এবং সংকীর্ণ সংস্কার প্রশমিত করার জন্য তিনি যা করেছেন তা আমি বলতে পারি, আমি জানি, এজন্য মহত্তম সম্মানের যোগ্য তিনি।"

এলবার্ট আইনষ্টিন রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন—"আপনি দেখেছেন প্রাণীজগতে ভয়ংকর হানাহানি, যার উৎস হচ্ছে প্রয়োজন ও অন্ধ কামনা। আপনি এর মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন শান্তসাধনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে। শান্তি ও সৌন্দর্যসাধনায় আপনি মানবজাতির সর্বদা সেবা করেছেন এক দীর্ঘ, ফলপ্রসূ জীবনে, সর্বত্র প্রচার করেছেন নম্র ও বিমুক্ত চিন্তাধারা, ঠিক আপনাদের মহান ঋষিদের আদর্শ অনুসারে।"

উইল ডুরান্ট ১৯৩১-এ এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "আমরা

মহত্তম কবি, আপনার শান্তিময় আশ্রম শান্তিনিকেতনে এসে কৃতার্থ হয়েছি। আমাদের এক নূতন বিশ্বাস এসেছে যে, এ-যুগেও এ-রকম জীবন সম্ভব, যা আমাদের ঐতিহ্যে সর্বোচ্চ আদর্শমূলক বলে ভেবেছি। আপনি আসার পূর্বে আমরা বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম যে সব আদর্শই মিথ্যা, সব আনন্দই বৃথা, কিন্তু আপনাকে দেখেই বুঝেছি যে, আমাদের আশংকা ও অবিশ্বাস ভুল হয়েছিল। আমরা বুঝেছি শক্তির সঙ্গে ন্যায়ের লড়াই এখনও শেষ হয়নি এবং জীবনে নূতন মূল্যবোধ এসেছে, যা মৃত্যুও ব্যর্থ করতে পারে না। প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শবাদ আমাদের মধ্যে আপনি ঢেলে দিয়েছেন, আপনার কাব্যের মাধুর্য ও রসধারায় এবং আপনার জীবনের মহান ঐশ্বর্যে।"

মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন, "আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কারণ তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও অসামান্য পবিত্র জীবন ভারতকে বিশ্বসভার মর্যাদার আসনে তুলেছে।"

LIBRARY 3205

"Presented free of cost with compliments from the Central Institute of Indian Languages (Government of India)-Mysore - 570006."

লেখক

'ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের লেখক, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসুমজুমদার, গত ষাট বছরের অধিককাল স্কুল, কলেজ, ইন্‌স্টিটিউট, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সোসাইটি কাউন্‌সিল প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজসেবায় রত আছেন।

সদ্য বিগত আশির দশকে কবি 'জীবনানন্দ'-এর 'রূপসী বাংলা' ইংরেজীতে (The Beauteous Bengal) অনুবাদ করে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের অভিনন্দন লাভ করেছেন।

তাঁর 'ভারতসাধক মহাত্মা গান্ধী', 'ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ', 'নব-নবীনের কবি নজরুল', 'সংগ্রামী কবি সুকান্ত'—এই লোকহিতকামী বইগুলিতে—রবীন্দ্রনাথ কেন ভারতবর্ষে সব থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, তিনি ভারতবর্ষের মানুষ এবং বিশ্বমানবসমাজের মহাভ্রাতৃত্বের কি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা কি ভাবে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যোগাতে থাকবে, তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। 'ভারতসাধক মহাত্মা গান্ধী' বইয়ে কোন্ সাধনার দ্বারা গান্ধী মহামানবে পরিণত হলেন এবং তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মধারা কি ভাবে ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর মানুষদের প্রভাবিত করেছে এবং করতে থাকবে, তা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। 'নব-নবীনের কবি নজরুল' বইয়ে শুধু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যে বাধাগুলি রয়েছে, তা দূর করে প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মহামিলনের কি সেতু তিনি রচনা করে সমগ্র বাঙ্গালী-জাতিকে এক মহান, সম্মিলিত, শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বাংলার অতি সংকটময় যুগেও (১৯৪২-৪৭) তৎকালীন সর্বকনিষ্ঠ কবি, সুকান্ত, কি ভাবে সে যুগে সব থেকে সার্থক প্রতিনিধি হলেন এবং বিশ্বের পটভূমিকায় তাঁর স্থান কিরূপ, তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

এই বইগুলি যেমন চিন্তা-উদ্দীপক, তেমন প্রেরণাদায়ক।